KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLG	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ২১/- ২১/- ২১/- ২১/- ২১/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ ॥ June 1973 আষাঢ় ১৩৮০ ॥ July 1973 ভাদ্র ১৩৮০ ॥ Sep 1973 কার্তিক ১৩৮০ ॥ Nov 1973 অগ্রহায়ণ ১৩৮০ ॥ Dec 1973
	Condition : Brittle ~~Good~~
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

একবিংশ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আমার রেল ভ্রমনের ছাড়পত্র

যদি কোনও যাত্রী বিনা টিকিটে কিম্বা বেঠিক টিকিট নিয়ে রেলে চাপেন, তবে আদালত তাঁকে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করতে পারে। সবচেয়ে কম জরিমানা হলো ১০ টাকা।

সঠিক টিকিট না নিয়ে ট্রেণে যাওয়ার সময়ে রেল কর্মচারীদের হাতে পড়বার আগেই যদি কোনও যাত্রী রেলভাড়া মিটিয়ে দিতে চান, তবে খুব কমে তাঁকে ৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

বিনা টিকিটে ট্রেণে যাওয়ার সময়ে যদি কেউ ধরা পড়েন, তাঁকে খুব কমে ১০টি টাকা জরিমানা দিতে হবে।

টিকিট কেটে ট্রেনে চাপা আরও সস্তা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

একবিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা ॥ স ॥ জ্যৈষ্ঠ তেরশ' আশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

ছোট গল্পের আত্মহত্যা ॥ প্রমথনাথ বিশী ৬১

রামমোহন মিশনারী বিতর্ক সম্বাদ ॥ গোরাচাঁদ মিত্র ৬৫

আচার্য ভানুভক্ত ॥ সলীল বিশ্বাস ৭২

ন্যাশনাল থিয়েটার ও তার নেপথ্য-নায়ক মধুসূদন ॥ পুলিন দাশ ৭৬

লোকবৃত্তের স্বপক্ষে ॥ শঙ্কর সেনগুপ্ত ৮৪

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ৯৩

আলোচনা ঃ কবিতা, আরাম, বিরাম, সংগ্রাম ॥ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় ৯৫

সমালোচনা ঃ গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভূদেব চৌধুরী ৯৮
ভারত ইতিহাস অভিধান ॥ হরপ্রসাদ মিত্র ১০৩

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

দীঘা

ঢেউয়ের কলতান ও ঝাউবনের মর্মর… নির্জন সোনালি সৈকতে আলস্যমধুর মন্থর উজ্জ্বল প্রহর উদ্‌যাপন… অথবা গম্ভীর সাগর-সংগীতের তালে তালে সমুদ্রস্নান…! 'দীঘা ট্যুরিস্ট লজ' অথবা 'সৈকতাবাস' অথবা 'চীপ ক্যান্টিনে' উঠতে পারেন।

'দীঘা ট্যুরিস্ট লজ' ও 'সৈকতাবাসে'র জন্য ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে অগ্রিম বুকিং যাত্রার তিনদিন আগে বন্ধ হয়।

ট্যুরিস্ট ব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ঈস্ট, কলিকাতা-১ ফোন: ২৩-৮২৭১ গ্রাম: TRAVELTIPS

জ্যৈষ্ঠ
তেরশ' আশী

সমকালীন

একবিংশ বর্ষ
২য় সংখ্যা

ছোট গল্পের আত্মহত্যা

প্রমথনাথ বিশী

বাংলা ছোট গল্প আত্মহত্যা করতে উদ্যত। উদ্যত বললে কম বলা হয়, প্রক্রিয়াটা অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছে এখন প্রায় অন্তিম মুহূর্ত। কেন এমন হল তা-ই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তার আগে একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছোট ছোট লিরিক কবিতা এবং ছোট গল্প। প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের কথা, বিশেষ চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের কথা বিস্মৃত না হয়েও বলা যায় যে বৈষ্ণব পদাবলীগুলিই উজ্জ্বলতম রত্ন। আবার প্রাচীন সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যের কথা ভুলে না গিয়েও বলা যায় যে গীতবিতান ও সঞ্চয়িতায় নিবদ্ধ কবিতাগুলিই উজ্জ্বলতম রত্ন। এসব হল পদ্য। গদ্য সাহিত্যের বিস্তার অনেক বেশি, তাতে রত্নরাজিও সুপ্রচুর তৎসত্ত্বেও ছোট গল্পগুলি অতুলনীয়। উপন্যাস সৃষ্টির পরে ছোট গল্পের সূচনা হলেও উৎকর্ষে ছোটগল্প ছাড়িয়ে গিয়েছে উপন্যাসকে। ১৮৯০ সালে ছোট গল্পের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথের হাতে, ১৯৪০ সালে বোধ করি তাঁর শেষ ছোট গল্প লিখিত। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নানা শাখা-প্রশাখায় সঞ্চারিত হয়ে ছোট গল্প একটা পরিণতিতে পৌঁছেছে। এই সময়ের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান ছোট গল্প লেখক দেখা দিয়েছেন, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, পরশুরাম, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবিতগণের নাম করলে তালিকা আরও দীর্ঘ করা যেতে পারে। বাঙালী কবির কণ্ঠে অনায়াসে যেমন গান আসে তেমনি তার কলমে সহজে আসে ছোট গল্প। এঁদের অনেকের ছোট গল্প বিদেশী লেখকদের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে এমন উন্নতি সম্ভব হয়েছে তার দুটো কারণ, ভাষার মর্জি আর লেখকের মেজাজ। এখন এহেন সম্পদের আত্মবিনাশ সাধন পরিতাপের বিষয় না হয়ে যায় না। এখন জিজ্ঞাস্য কেন

এমন হল? অর্থাৎ এ দায়িত্ব কার? দায়িত্ব সকলকেই ভাগ করে নিতে হবে আর তাতেই কেনর উত্তর পাওয়া যাবে।

এক সময় মাসিক পত্রাদিতে ছোট গল্পের আদর ছিল। এখন নেই এমন বলছি না তবে আগের মতো নয়। মাসিকে ছোট গল্পের আদর থাকলেও সেই সব ছোট গল্প যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন আর সে আদর থাকে না। যে কোন প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা যাবে যে ছোট গল্পের বই বিক্রি হতে চায় না অর্থাৎ পাঠক উদাসীন বা অনীহাযুক্ত। কাজেই বিচারটা পাঠকের দিক থেকে আরম্ভ করা যাক।

পাঠক অর্থাৎ খদ্দের বইয়ের দোকানে এসে বই হাতে নিয়ে শুধায় একটানা তো? অস্তার্থ কাটা কাটা ছোট গল্প চলবে না, একটানা উপন্যাস হওয়া চাই, তার উৎকর্ষ বা লেখক যেমনি হোক। প্রকাশক সরাসরি উত্তর না দিয়ে বল্‌ল দেখুন না। খদ্দেরের তাড়া আছে, বই কেনাই একমাত্র কাজ নয়, তাই সে একবার দ্রুত পাতাগুলো উল্টে গেল। পাতার উপরে নাম নেই, বোঝা যায় না উপন্যাস কি ছোট গল্প। পৃষ্ঠার মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট গল্পের নামাঙ্ক থাকলেও ব্যস্ততায় চোখে পড়লো না। তার উপরে যখন বইখানা হাতে নিয়ে দেখল দামে ভারি, মনে মনে হয় তো কেদার চাটুজ্জের মতো ভাবলো বেশ দিব্যি পুরুষ্ট পাঠা, বল্‌ল আচ্ছা দিন। তারপরে বাড়ী গিয়ে যখন আবিষ্কার করলো একটানা নয়, কাটা কাটা তখন কি ভাবলো লেখকা অনুমান না করাই ভালো। তবু মূল প্রশ্নের সম্যক উত্তর পাওয়া গেল না। যে পাঠক মাসিকের পাতায় ছোট গল্প আগ্রহ করে পড়ে, গল্প সমষ্টিতে তার অনীহা কেন। মাসিকে হয় তো ২।৩ টা ছোট গল্প থাকে তা-ও আবার ভিন্ন হাতের রচনা এক রকম চলে যায়। তাছাড়া পত্রিকাখানায় নিশ্চয় গোটা দুই ক্রমশঃ একটানা আছে প্রধানত সেই লোভেই কেনা, কাজেই মৎস্যরসিক যে মনোভাবে মাছের কাঁটাগুলোকে সহ্য করে সেই মনোভাবেই ছোট গল্পগুলো সহনীয় হয়। কিন্তু গ্রন্থাকারের গল্প সমষ্টি অচল কেন? গল্প থেকে গল্পান্তরে যেতে রসের রূপের ঘটনার বদল হয়—সেই আবশ্যিক ধাপ্পাটুকু অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে অসহ্য। রেলগাড়ী মন্থর গতিতে চলতে চলতে মাঝে মাঝে লাইন বদলাবার সময় ঝাকুনি দেয়, আরোহী চমকে ওঠে; তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে সেটা আবার প্রবলতর। অধিকাংশ পাঠকের মন তৃতীয় শ্রেণীর, (আর্থিক বিচারে নয়, শিক্ষাদীক্ষার বিচারে) তারা মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে, পয়সা খরচ করে এ ধাক্কা খাওয়া কেন! একটানা মসৃণ গতি তাদের কাম্য। আগেই বলেছি অধিকাংশ পাঠকের মন তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ অমাড় জড় ও রসের বাজারে আনাড়ি। কাজকর্মের অবকাশে তারা কিছুক্ষণের জন্য মসৃণ আরাম চায় তার বেশি দাবী পুস্তকের উপরে তাদের নেই। কাজেই তাদের বাজারে ছোট গল্পের রূপান্তর রসান্তর ঘটনান্তর অচল। চাই উপন্যাস। আরও উপন্যাস। দেখে ঠেকে ভুগে সম্পাদক ও প্রকাশক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে—কাজেই লেখকও।

এখানে দু' একটা কথা বলে নি; হয়তো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হতেই প্রশ্ন শুনি—বলি কি লিখছেন। চেয়ে দেখি মুখে তার অসীম প্রত্যাশা। হয় তো বল্‌লাম বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিম্বা গীতার অনুবাদ। আশাভঙ্গের মুখে তিনি বললেন ওসব তো হল, বলি আসল কি লিখছেন? স্বীকার করতে হল 'আসল' এখন কিছু লিখছি না। প্রশ্নকর্তার নাটকীয়

পরিভাষায় 'সবেগে প্রস্থান'। আসল মানে উপন্যাস। এখানেই বাংলা সাহিত্যের সর্বনাশ ও ছোট গল্পের সমাধি। এদেশে যে লেখক উপন্যাস লেখেননি সে সাহিত্যিক বলে গণ্য নয়। এই বিচিত্র মাপকাঠি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রযুক্ত হলে বেকন বার্ক কার্লাইন রাস্কিন ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি বাদ পড়ে যান। উপন্যাস লেখেননি যে। 'আসল' যখন আত্যন্তিক হয়ে ওঠে তখন তা যে ভেজালে ভরতি হয় এই অতি সরল সত্যটি বুঝতে এখনো কপালে অনেক দুঃখ আছে।

এবার সম্পাদক ও প্রকাশক। তাঁরা ব্যবসায়ী, পাঠকের মন জুগিয়ে না চল্‌লে কাগজ ও ব্যবসা চলে না। কাজেই তাঁরা লেখকের শরণাপন্ন হলেন, উপন্যাস লিখুন। লেখক দেখলেন এ মন্দ নয়। ছোট গল্প লিখে মাসিক থেকে টাকা পাওয়া যায়—গ্রন্থকারে প্রকাশিত হলে বিশেষ কিছু মেলে না। কাজেই পত্রিকায়, বিশেষ করে পূজা সংখ্যা, কিম্বা নববর্ষ সংখ্যা প্রভৃতিতে উপন্যাস লেখায় লাভ বই ক্ষতি নেই। প্রথমত পত্রিকা থেকে দক্ষিণা বেশি পাওয়া যায়—আবার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও রয়ালটি। কিন্তু অধিকাংশ পত্রিকা যখন উপন্যাস ছাপতে শুরু করলো তখন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। কোন পত্রিকা যদি পাঁচখানি 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাস ছাপলো, প্রতিযোগী ছাপলো সাতখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। তার পরে 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাসের ঢল নামলো। এখন সহজেই অনুমেয় এই সব উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গতা নামে মাত্র, খুব বেশি হবে তো ৪।৫ ফর্মা। তারপরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে আরও ২।৩ ফর্মা বাড়ানো, তাতেও না কুলোলে 'পাইকা' অক্ষর তো আছেই। ফলে দাঁড়ালো এ সব না ছোট গল্প না উপন্যাস। এরা রক্তপায়ী জোঁকের মতো স্ফীতোদর একটা প্রাণী। এতে না আছে ছোট গল্পের সূক্ষ্মকলা-কৌশল, না আছে উপন্যাসের জীবন বিস্তার, আছে স্ফীতোদর ব্যবসায়িতা। এ শ্রেণীর দায়িত্বহীন রচনার মতো সহজ কাজ আর নেই।

কপি রাইটের নিষেধ না থাকলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা, কিম্বা রাসমণির ছেলের মতো গল্পকে অনায়াসে ৭।৮ ফর্মার উপন্যাসে পরিণত করা যায়, তাতে তাদের রস এক বিন্দুও বাড়বে কিনা সন্দেহ। আবার এ জাতীয় 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাসকে কমিয়ে এনে এক ফর্মার ছোট গল্পে পরিণত করা চলে—এখানেও বাধা কপি রাইট, নতুবা দুই শ্রেণীর রচনার দুটি উদাহরণ তৈরি করে দেখাতে পারা যেতো। অনেকে বলতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্র তো করেছেন, ছোট ইন্দিরা ও ছোট রাজসিংহকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত করেছেন। আমার বিশ্বাস আরও কিছুকাল বাঁচলে হয় তো তিনি যুগলাঙ্গুরীয়কেও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতেন। এ তিনখানাই বৃহৎ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত খসড়া, রাধারাণীও তাই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন পূর্ণাঙ্গ ইন্দিরা ও পূর্ণাঙ্গ রাজসিংহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ। নাম সাম্যে ওদের এক মনে করা উচিত হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র নূতন করে রক্তমাংস দিয়ে নূতন রচনা করেছেন—এ জৈবিক রূপান্তর। এখন যা চলছে তা টেনে লম্বা করা মাত্র তার মধ্যে জীবনীশক্তির ক্রিয়া নাই।

ছোট গল্পের বস্তুকে কৃত্রিম উপায়ে টেনে উপন্যাসে পরিণত করতে গেলে কৃত্রিম উপন্যাস হওয়া ছাড়া আর কি হবে। ছোট গল্প ও উপন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের শিল্পকলা। ছোট গল্পে পাত্রপাত্রী আছে, আবার পরিণাম আছে—এর দুয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সংযোগ সাধনে ছোট গল্পের সার্থকতার রহস্য—এ অনেকটা সনেট জাতীয় রচনার সগোত্র। উপন্যাসেও এই স্বাভাবিক সংযোগসাধন আছে

তবে তা সরাসরি সরল পন্থায় নয়, নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তারিত জটিল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। ছোট গল্প জীবনখণ্ড, উপন্যাস জীবন বিস্তার। এ দুয়ে যে কখনো সংযোগ করা চলে না তা নয়, তবে বর্তমানে যে ভাবে হচ্ছে তেমন করে নয়, কেমন করে তার ক্লাসিক দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। ছোট গল্পের স্বকীয়তা রক্ষা করে ওর মধ্যে জীবনবিস্তার আনবার চেষ্টা আছে। এখনকার মাসিক পত্রের অধিকাংশ উপন্যাস ঘটনার বস্তাবন্দী রূপ। পাঠকে যদি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে তার কারণ অমার্জিত মনের অসারতা—খানিকটা একটানা দৈর্ঘ্য পেলেই খুশী। এর ফল হচ্ছে ছোট গল্পের প্রকৃতি ও উপন্যাসের প্রকৃতি দুই ব্যাহত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে যে অনবদ্য ছোট গল্প সাহিত্যে গড়ে উঠেছিল কোথায় পরবর্তীগণ তার উন্নতিসাধন প্রয়াস করবে, না, তার বদলে করছে তার বিলোপসাধন চেষ্টা। এমন ভাবে চললে আর কিছু দিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য থেকে ছোট গল্পের ধারা মুনাফা-শিকারী ব্যবসায়ীদের এবং মুনাফালোভী লেখকদের অশুভ যোগাযোগে লোপ পাবে—আর যা রচিত হয়ে উঠবে তাকে উপন্যাস বলা মনের সঙ্গে চোখঠারা মাত্র। লেখক সম্পাদক প্রকাশক সকলেরই সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে—আর পাঠক! পাঠক তৈরি করা এঁদের তিনজনেরই দায়িত্ব। কিন্তু হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। অমার্জিত রুচি পাঠকের গল্পগ্রাসী ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে গিয়ে রস সাহিত্যের দুটি প্রধান ধারাকে সকলে মিলে নিষ্ফলতার মরু বালুকার দিকে চালিত করছেন। অতএব সাধুগণ সাবধান। ছোট গল্পের আত্মহত্যার অস্ত্রে শাণ দেওয়া থেকে তারা এখনই নিবৃত্ত হোন।

রামমোহন মিশনারী বিতর্ক সম্বাদ

গোরাচাঁদ মিত্র

জ্ঞানের প্রদীপ্ত উজ্জ্বল আলোকে রাজা রামমোহন রায় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন এ দেশের প্রতিটি মানুষের চিন্তাকে। তাঁর সমগ্র জীবন সমস্ত রকম অন্ধ গোঁড়ামি, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—কোন ধর্মকেই তিনি পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রত্যেক ধর্মেরই কোন না কোন কুসংস্কার তাঁর যুক্তিবাদী মনের কাছে ধরা পড়েছিল। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন দেশবাসীর আর্থিক ও সামাজিক গ্লানির হেতু। প্রাচীন ভারতের শাশ্বত দর্শন অধ্যয়ন করে রামমোহন আঘাত হানলেন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে—যে পৌত্তলিকতা আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে সমাজের কোন গঠনমূলক কর্মে উদ্যোগী হতে বাধা দেয়—যে পৌত্তলিকতা বিভিন্ন ক্ষতিকারক ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আমাদের প্ররোচিত করে। মুসলমান ধর্মের একেশ্বরবাদের প্রতি আপন প্রত্যয়ে অটল থেকেও হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রতি মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচারকে তিনি 'তুহফত-উল-মুয়াহিদ্দীন' বা 'একেশ্বরবাদীদিগের প্রতি উপহার' গ্রন্থে শাস্ত্রবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিভিন্ন চিঠি পত্রাদিতে খৃষ্টানধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও, খৃষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদের অসারত্ব প্রমাণে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি।

উনিশ শতকের প্রথম বৎসরগুলিতে বিভিন্ন কারণে কলকাতা যাতায়াতের সূত্রে রামমোহনের সঙ্গে অনেক বিদেশীর পরিচয় ঘটে। ১৮১৫ সালে রামমোহন যখন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করতে আসেন তখন বেশ কয়েকজন খৃষ্টান পাদরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। তাঁদের সঙ্গে ধর্মবিষয়ক আলোচনায় রামমোহন বিশেষভাবে অংশ নিতেন। কলকাতায় এসেই হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিতর্কে নামলেন। তাঁর এই মনোভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা। বিদেশীর দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রামমোহন প্রশংসিত হলেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা সর্বত্র প্রচারিত হল। অনেক মিশনারী অনুমান করলেন—রামমোহন বুঝি বা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি রামমোহনের প্রীতির বহিঃপ্রকাশ প্রথমে ঘটে এককালীন মনিব ও অকৃত্রিম সুহৃদ জন ডিগবীকে লেখা এক পত্রে। এই চিঠিতে রাজা লিখছেন—'ধর্মীয় সত্য অন্বেষণে আমার দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন গবেষণার পরিণতিতে আমি উপলব্ধি করলাম যে খৃষ্টীয় ধর্মশিক্ষা, অন্যান্য আমার দেখা ধর্মের শিক্ষাবলীর চাইতে নৈতিক সত্যের অনেক বেশী অনুকূল এবং বিদেশী মানুষের প্রয়োজনে অধিক উপযোগী' (অনুবাদ লেখককৃত)। কাজেই পাদরীদের অনুমান আপাতচক্ষে অমূলক ছিল না নিশ্চয়। কিন্তু রামমোহন-চরিত্রের সঙ্গে সম্যক পরিচয় তাঁদের তখনও ঘটেনি। যীশুখৃষ্টের মহিমাময় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট রামমোহন ১৮২০ সালে দেশের মানুষের মধ্যে যীশুর অমৃতময় বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করলেন দি পারসেপ্টস্ অব্ জিসাস্—দি গাইড টু পীস্ এণ্ড হ্যাপীনেস' বা 'যীশুর উপদেশ সংগ্রহ—সুখ ও শান্তির সহায়ক'। বইটি মুদ্রিত হয় ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে। বইটির ভূমিকা থেকে জানতে পারি রামমোহন 'যীশুর উপদেশ

সংগ্রহ' পুস্তকের বাংলা ও সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনুবাদগুলি পাওয়া যায় নি। এ সম্পর্কে অনেকের অভিমত রামমোহনের মনে অনুবাদ প্রকাশের বাসনা থাকলেও পরবর্তীকালে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ফলে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। পূর্বোক্তেই তিনি 'যীশুর উপদেশ সংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকায় এর উল্লেখ করেছেন। এ অনুমান একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় যীশুর উপদেশ সংগ্রহ রাজার জীবনে সুখ ও শান্তি আনয়নে সহায়তা করার পরিবর্তে নিয়ে এল মানসিক অশান্তি। প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়লেন রামমোহন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত এল শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। এর কারণ রামমোহন তাঁর সংকলনে যীশুর অলৌকিকত্ব-বিষয়ক সমস্ত ঘটনা বাদ দিয়েছিলেন। কারণস্বরূপ রাজা ভূমিকায় লিখছেন—'আমি মনে করি যে নিউ টেষ্টামেণ্টের অন্যান্য বিষয় থেকে নৈতিক চিন্তার বস্তুগুলি আলাদা করে বেছে নিলে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষের মন ও হৃদয়ের উপর তার সুপ্রভাব বিস্তার করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক এবং আরও কতকগুলি বিষয় স্বাধীনচেতা ও খ্রীষ্টধর্মবিরোধী লোকদের সন্দেহ ও বিতর্কের বস্তু হতে পারে। বিশেষ করে টেষ্টামেণ্টের অত্যাশ্চর্য ঘটনাগুলি এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রচলিত রূপকথাগুলির মতো চমকপ্রদ মোটেই নয়, সুতরাং তাদের প্রভাবও অতি সামান্য হতে বাধ্য। অপরপক্ষে নৈতিক শিক্ষাগুলি বিরাট মানব-সমাজের শান্তি ও সামঞ্জস্য রাখার অনুকূল, দার্শনিক চিন্তাবিকৃতির ভয়মুক্ত এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের কাছে সমভাবে সহজবোধ্য। ধর্ম ও নীতির সাধারণ নিয়মগুলি মানুষের আদর্শকে ভাগবানের উচ্চ ও উদার চিন্তায় উন্নীত করার পক্ষে এত অনুকূল, নিজের ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে সেগুলি প্রচলনে ভালো ফল ফলবেই আমি আশা করি' (সোমেন্দ্রনাথ বসুকৃত অনুবাদ)। রামমোহনের এই উদার-নীতি মিশনারী সম্প্রদায় কিন্তু সমর্থন করলেন না।

১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাসিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় 'একজন খৃষ্টান মিশনারী' যীশুর উপদেশ-সংগ্রহ পুস্তকের একটি বিরুদ্ধ-সমালোচনা লিখলেন। রামমোহনের পুস্তিকা প্রকাশ ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত সমালোচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত কম যে মনে হয় যীশুর উপদেশ-সংগ্রহ প্রকাশের পূর্ব থেকেই মিশনারীরা মূল রচনার পাণ্ডুলিপি পাঠ করে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই অনুমান দৃঢ় হওয়ার পেছনে আর একটি কারণ—বইটি ব্যাপাটিষ্ট মিশন প্রেস থেকেই মুদ্রিত হয়েছিল। মিশনারী মতের বিরোধী পুস্তক মিশনারী প্রেস থেকে প্রকাশিত হওয়া সন্দেহ জনক বইকি। ছদ্মনামের আড়ালে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় সমালোচক ছিলেন Rev. Deocar Schmidt. কিন্তু পূর্বে Schmidt সাহেব রামমোহনের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় রামমোহন অনূদিত বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করে তিনি রামমোহনের সঙ্গে পত্রালাপে ইচ্ছুক হন। এবং ১৮১৯ সালের এপ্রিল মাসে এক পত্রে রামমোহনকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। পরবর্তীকালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এই চিঠিটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' আগষ্ট মাসে লিখেছিলেন—'The careful perusal of the letter we would earnestly recommend to Rammohun Roy, whom we highly esteem, for his courageous opposition to error and corruption of manners, as far

as it has extended, and should rejoice to see him make the word of God the man of his Counsel…'অবস্থা ততদিনে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক যশুয়া মার্শম্যান যীশুর উপদেশ-সংগ্রহ পুস্তকের সমালোচনার সঙ্গে কয়েকটি কটু মন্তব্যও ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। এই সমালোচনা সমগ্র মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব। মার্শম্যানের মতে এই পুস্তিকার রচয়িতা জগতের উদ্ধারকর্তা যীশুখৃষ্টকে কনফুসিয়াস বা মহম্মদের সঙ্গে একই আসনে বসিয়েছেন এবং মানুষের উদ্ধারকর্তা সর্বময় প্রভু হিসেবে সম্মানিত করার পরিবর্তে সংকলক তাঁকে শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর প্রবর্তক ও শিক্ষকরূপে বিবেচনা করেছেন। ক্রোধে অন্ধ মার্শম্যান রামমোহনকে আখ্যায়িত করলেন—'একজন বুদ্ধিমান হিদেন যার মন পরমেশ্বরের মানবাকারে অবতীর্ণ হওয়ার মহৎ অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিরোধী'—বলে। এই সমালোচনায় রামমোহন দুঃখ পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ১৮২০ সালে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি প্রকাশ করলেন ফাষ্ট আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক বা বা 'খৃষ্টান জনগণের প্রতি প্রথম আবেদন'। মার্শম্যানের কটূক্তিতে ব্যথিত রামমোহন প্রথম আবেদনের গোড়াতেই লিখলেন—'যীশুর উপদেশ সংগ্রহ পুস্তকের বিরুদ্ধে সমালোচকের মতামতের ভিত্তি কী—তা যাচাই করার পূর্বে সম্পাদকের অসভ্য ও খৃষ্টানবিরোধী চরিত্রের প্রতি আমি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্পাদক মহাশয় সংকলকের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করে তাঁকে 'হিদেন' রূপে অভিহিত করেছেন। খৃষ্টানবিরোধী বললাম এই কারণেই যে সম্পাদক মহাশয় 'হিদেন' শব্দ ব্যবহার করে, আমার মতে সত্য, ঔদার্য ও বদান্যতা, যা খৃষ্টধর্মের মূল ভিত্তি, তা ভঙ্গ করেছেন'। কিন্তু গোঁড়ামির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যদি সম্পাদক মহাশয় মুক্ত মনে বিচার করতেন, তাহলে দেখতেন 'সংকলক শুধুমাত্র একেশ্বরবাদেই নয় খৃষ্টান ধর্মের শাশ্বত সত্যের প্রতিও সমানভাবে বিশ্বাসী। সমালোচকের মত যাচাই করতে গিয়ে রামমোহন লিখছেন—'গোঁড়ামির বিভিন্ন ব্যাখ্যাই যীশুর অনুগামীদের মধ্যে এত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করেছে। সেগুলি শুধুমাত্র খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য ও অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যই নষ্ট করেনি, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের চাইতেও ভীষণ আকারের অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ ও রক্তপাতের মূল কারণও এই ধর্মীয় গোঁড়ামিসকল। খৃষ্টান দেশগুলির ইতিহাসের দিকে সামান্য নজর দিলেই পাঠকগণ আমার উক্তির সভ্যতা যাচাই করতে পারবেন। তদুপরি, যে স্থানে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ বিগত বিশ বৎসরেরও অধিক সময় ধরে খৃষ্টীয় ধর্মের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত বাইবেলের অসংখ্য কপি নিষ্ফলভাবে বিলি করে চলেছেন, সংকলক সেখানকার অধিবাসী। কাজেই তাঁদের বিফল মনোরথ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। অবশ্য লেখক ধর্মপ্রচারকদের নিষ্ঠা কিংবা অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশে ব্যয়িত বিরাট অঙ্কের টাকার হিসেবের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করছেন না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে ধর্মীয় চার্চে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গোঁড়ামি ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা এদেশীয়দের মনে প্রবিষ্ট করানোর চেষ্টা ধর্মপ্রচারকদের হিতৈষী আদর্শের পরিপন্থী। কারণ এদেশের মানুষ এ সকল অত্যাশ্চর্য ঘটনা গ্রহণে মোটেই ইচ্ছুক নন। জ্ঞানালোকের দ্বারা ভারতবর্ষের মানুষের মনের অন্ধকার দূর করতে ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টা এতই অসতর্ক এবং অবিবেচনাপ্রসূত যে দেখে মনে হয়

তাঁরা কোন খৃষ্টান দেশে আনীত মানুষের সঙ্গে তাঁদের নাবালকত্বপ্রসূত ধর্মীয় গোঁড়ামি বা অন্ধতা নিয়ে বিতর্কে রত' (অনুবাদ লেখককৃত)। ফলে এদেশবাসীর কোন ধর্মীয় উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয়নি। তাই খৃষ্টীয় সত্যকে ভারতবাসীর মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহন যীশুর উপদেশ সংগ্রহ সংকলনটি প্রকাশ করেছিলেন। অপ্রত্যাশিত বিরুদ্ধ-সমালোচনা স্মরণে রেখে রামমোহন 'প্রথম আবেদনের' উপসংহারে প্রার্থনা জানালেন—'May God render religion destructive differences and dislike between man and man and conducive to the peace and union of mankind—Amen.' মার্শম্যান সাহেবও প্রস্তুত ছিলেন। মাসিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় মে মাসে তিনি রামমোহনের 'প্রথম আবেদনের' ছত্রপৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা লিখলেন। মার্শম্যান তাঁর পূর্ব বক্তব্যে অটল থাকলেও, এই সমালোচনায় তাঁর সুর অনেক নরম, আচরণ সংযত। সমালোচনার উপসংহারে মার্শম্যান লিখছেন—'আলোচনাকালে আমরা অতি সতর্কতার সঙ্গে আমাদের মত প্রকাশ করেছি যাতে তাঁর মনে সামান্যতম আঘাতও না লাগে। আমরা তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছি যদি কোন কুইঙ্গিত তাঁর নজরে আসে তাহলে তা সম্পূর্ণ অনবধানতাবশতঃ এবং এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য যেন তিনি আমাদের ক্ষমা করেন, কারণ নির্মল সত্য প্রকাশই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য' (লেখককৃত অনুবাদ)। ১৮২১ সালে রামমোহন প্রকাশ করলেন 'সেকেণ্ড আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক' বা 'খৃষ্টান জনগণের প্রতি দ্বিতীয় আবেদন'। মার্শম্যানের বক্তব্য উপস্থাপন রামমোহনের কাছে 'মাইল্ড' এবং 'ক্রিশ্চিয়ান লাইক' বলে মনে হল। কিন্তু তাতে মূল বিতর্কের বিন্দুমাত্র সুরাহা হল না। পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনার পর রামমোহন লিখলেন—'যদি খৃষ্টধর্ম ঈশ্বরবাদ সমর্থন করে এবং কখনও ঈশ্বর মানুষের আকারে, কখনও বা পাখীর আকারে দেখা দেন—এরূপ উপদেশ দেয়, তাহলে আমার মতে যে সকল হিন্দু সত্যান্বেষণে ব্যাপৃত তাঁরা হিন্দুধর্মের পরিবর্তে খৃষ্টধর্ম দ্বারা কোন প্রেরণা লাভ করবেন না। কারণ হিন্দুধর্ম এক পরমেশ্বরের উপাসনার বিধান দিলেও, আধুনিক হিন্দুধর্ম বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী। সেই কারণেই হিন্দুধর্মের আজ এই শোচনীয় অবস্থা। আমি কিন্তু মনে করি খৃষ্টানধর্ম সর্বরকম পৌত্তলিকতামুক্ত। তাই সুখ ও শান্তির সহায়করূপে এই ধর্মের নীতিগুলি প্রকাশের অনুমতি আমি আমার বিবেকের কাছ থেকে পেয়েছি'। বিরোধ চরমে উঠল। খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ বিভিন্নভাবে হিন্দুধর্মের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ হানলেন। হিন্দুধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সমাচার-দর্পণ পত্রিকার ১২ই জুলাই সংখ্যায় কোন বিজ্ঞব্যক্তি দ্বারা দূর দেশ থেকে প্রেরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হল। পত্রটিতে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞ-প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে ছয়টি প্রশ্ন পেশ করা হল। পত্রলেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী পত্রিকা সম্পাদক প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রত্যাশা করলেন। হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান সমাজপতিরা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে কেউ এগিয়ে এলেন না। পরিবর্তে রামমোহন 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মণঃ' নামে প্রশ্নগুলির দীর্ঘ উত্তর পাঠালেন। কিন্তু দর্পণ সম্পাদক সেই পত্র প্রকাশের সাহসিকতা প্রদর্শনে অক্ষম হলেন। ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হল সম্পাদকের বিবৃতি—'শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্মা প্রেরিত পত্র এখানে পৌছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে অনেক অজিজ্ঞাসিতাবিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাবিধান দোষ

বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইতে বাধা নাই, অন্যথা সর্বসমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই'। খৃষ্টান সমাজের এই মনোভাবে ক্ষুব্ধ রামমোহন ১৮২১ সালের শেষার্ধে প্রকাশ করলেন 'ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ' বা Brahmunical Magazine নামে একটি দ্বিভাষী সাময়িক পত্র। এবং সেই পত্রিকায় দর্পণের প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। পত্রিকাটির এক পৃষ্ঠা বাংলা ও অপর পৃষ্ঠা ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত হতো। ব্রাহ্মণসেবধি বাংলা ভাষায় তৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত এবং ইংরেজী ভাষায় চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ সেবধির প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় এ দেশবাসীর ধর্মবিষয়ে ইংরেজ শাসকদের অনুসৃত নীতি প্রসঙ্গে রামমোহন লিখছেন—'শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তিক্রমে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন'। প্রথম প্রকার নানাবিধ পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে তা এ দেশবাসীর মধ্যে বিলি করছেন এই মিশনারীরা। পুস্তক-পুস্তিকাগুলি শুধুমাত্র 'হিন্দুর ও মোছলমান ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ।' দ্বিতীয় প্রকার—মিশনারীরা বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে অথবা প্রকাশ্যে রাজপথে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে খৃষ্টধর্মের উৎকর্ষতা এবং অন্যান্য ধর্মের অপকৃষ্টতা প্রমাণে ব্যস্ত। তৃতীয় প্রকার—অর্থের লোভ দেখিয়ে অন্য ধর্মের গরীব মানুষকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছেন। পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করে রামমোহন দেখাচ্ছেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভিন্নধর্মাবলম্বী শাসকশ্রেণী শোষিতশ্রেণীর ধর্মের প্রতি উপহাসে মত্ত এবং শোষিতকে তাঁদের ধর্মগ্রহণে বাধ্য করেছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করলে ইংরেজ মিশনারীদের এই ধর্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস 'অসম্ভাবনীয়' নয়। 'কিন্তু ইংরেজরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না'। এ দেশবাসীর ঘাড়ে জোর করে খৃষ্টধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে মিশনারীরা যদি বিচার বলে তাঁদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারেন তাহলে অনেকেই তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আর্থিক দুর্বলতা দেখে মিশনারীরা যেন তাঁদের উপেক্ষা না করেন। কারণ 'সত্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে'। ব্রাহ্মণ সেবধির প্রথম দুটি সংখ্যায় রামমোহন সমাচার দর্পণে প্রকাশিত প্রশ্নগুলি সমেত তার উত্তর প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় খৃষ্টীয় ঈশ্বরবাদ প্রসঙ্গে তিনি মিশনারীদের কাছে পাল্টা প্রশ্ন রাখছেন—'যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। যীশুখ্রীষ্টকে কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন কোনো মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না। ঈশ্বর এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলি গোষ্ট ঈশ্বর। ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক

শরীরে যীশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট পিতা হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতার তুল্য হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে তুল্যতা সম্ভবে না'। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ৩৮ সংখ্যায় প্রশ্নগুলির উত্তর প্রকাশিত হল। রামমোহন ব্রাহ্মণ সেবধির তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ করে ধর্মপ্রচারকের সমস্ত যুক্তি ছিন্ন ভিন্ন করলেন। দীর্ঘকাল এর কোন উত্তর প্রকাশিত হল না।

ইতিমধ্যে ১৮২১ সালের শেষাশেষি মার্শম্যান সাহেব রামমোহনের 'দ্বিতীয় আবেদনের' সমালোচনা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশ করলেন। মার্শম্যানের মতে 'সেকেণ্ড আপীল' পুস্তকটি 'Contains no less than an entire rejection of the doctrines of the Atonement, the Deity of Christ and the ever blessed Trinity'. সমালোচনার শেষে রামমোহনের কাছে সমগ্র বিষয়টি পুনর্বার বিবেচনা করতে এবং আদ্যোপান্ত মূল বাইবেল পাঠের সবিনয় অনুরোধ জানালেন মার্শম্যান। মার্শম্যানের প্রার্থনা—'মহানুভব ঈশ্বর যেন তাঁকে পরমেশ্বরকে অনুভব করার শক্তি যোগান'। মার্শম্যানের সঙ্গে বিতর্ককালে দেশীয় ভাষায় অনূদিত বাইবেলের অভাব রামমোহনকে বাইবেলের অনুবাদ কার্যে উৎসাহিত করল। রামমোহন শ্রীরামপুরের দুজন খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক রেভাঃ ইয়েটস ও রেভাঃ এডাম সাহেবকে নিয়ে বাইবেল অনুবাদে ব্রতী হলেন। কিন্তু ১৮২২ সালের মাঝামাঝি ইয়েটস অনুবাদ বিষয়ে রামমোহন সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন। বাইবেলের চতুর্থ সুসমাচার অনুবাদের সময় 'dia' শব্দের অর্থ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। শব্দটির দুটি অর্থ হয়—'দ্বারা' এবং 'মধ্য দিয়া'। আলোচিত বাক্যটির অনূদিত অর্থ হয়—'সমস্ত কিছু যীশুর দ্বারা সৃষ্টি' অথবা 'সমস্ত কিছু যীশুর মধ্য দিয়া সৃষ্টি'। পূর্ববর্তী অনুবাদ কার্যে প্রথম বাক্যটি গৃহীত হলেও, এঁরা সকলেই দ্বিতীয় বাক্যটিকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কিন্তু কিছুদিন পর ইয়েটস প্রথম অর্থ সমর্থন করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল দ্বিতীয় বাক্যটি গ্রহণ করলে খৃষ্টধর্মের বিরোধিতা করা হবে। বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হল। এডাম সাহেব কিন্তু রামমোহনের যুক্তিবাদী মন ও চরিত্রের পরিচয় পেয়ে ধীরে ধীরে তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ হলেন। খৃষ্টধর্মের ত্রীশ্বরবাদ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল এডামের মনে। হঠাৎ একদিন এডাম নিজেকে একেশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করলেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মিশনারী সম্প্রদায় চমকিত হলেন। ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি এডামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। বাইবেলের অনুবাদ কার্য পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছিল।

'সেকেণ্ড আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক' গ্রন্থের বিরুদ্ধে মার্শম্যান সাহেবের সমালোচনার যোগ্য উত্তর দেওয়ার জন্য রামমোহন হিব্রুভাষায় মূল বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করলেন। দীর্ঘ দু বছর পর প্রকাশ করলেন খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শেষ আবেদন বা Final appeal to the Christian public' রামমোহনের পূর্ববর্তী পুস্তকগুলি ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হলেও 'শেষ আবেদন' তাঁরা প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। বিপুল আত্মমর্যাদার অধিকারী রামমোহন নিজব্যয়ে প্রেস কিনে 'শেষ আবেদন' প্রকাশিত করলেন। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৭৯। রামমোহনের খৃষ্টিয় ধর্মবিষয়ক অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিবত্তার আশ্চর্য পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। উপসংহারে রামমোহন লিখছেন—'I tender my humble thanks for the Editors kind

suggestion in inviting me to adopt the doctrine of the Holy Trinity; but I am sorry to find that I am unable to benefit by this advice. After I have long relinquished every idea of a plurality of Gods, or of the persons of the Godhead, taught under different system of modern Hindooism, I cannot conscientiously and consistently embrace one of a similar nature, though greatly refined by the religious reformations of modern times; since whatever arguments can be adduced against a Plurality of persons of the Godhead and, on the other hand, whatever excuse may be pleaded in favour of plurality of persons of the Deity can be offered with equal propriety in defence of Polytheism. ত্রৈমাসিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার নবম ও একাদশ সংখ্যায় মার্শম্যান সাহেব রামমোহনের বক্তব্যের উত্তর দিতে চেষ্টা করলেও তা শুধুমাত্র গিলিত চর্বণ।

রামমোহন মার্শম্যান বিতর্ক দেশে প্রচণ্ড উৎসুকের সঞ্চার করেছিল। 'একজন খৃষ্টবিশ্বাসী' ১৮২১ সালে ক্যালকাটা জর্ণাল পত্রিকায় রামমোহন সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'Blessed with the light of Christianity he dedicates his time and his money not only to release his countrymen from the state of degradation in which they exist, but also to diffuse among the European masters of his country, the sole true religion—as it was promulagated by Christ, his apostles and disciples. ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকার মতে রামমোহনের প্রতি খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদের আক্রমণ—'injudicious and weak.···The effect of that attack was to rouse up a most gigantic combatant in the Theological field—a combatant who, we are constrained to say has not met with his match here.' রামমোহনের সঙ্গে বিতর্ক চলাকালে একটি ব্যক্তিগত পত্রে মার্শম্যান সাহেব তাঁর নিজের লেখাগুলি সম্পর্কে বলছেন—'these are the only articles one Divinity. I have ever written, and some may be apt to think me, from the 'Friend of India,' more of a politician than a divine; yet the study of divinity is my highest delight (Life and times of Carey, Marshman and Ward—J. C. Marshman, Vol-II Page—239).

রামমোহনের ধর্মীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু চিত্তের গতি প্রকৃতি নির্ণয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোর আগে খৃষ্ট্রীয় ধর্ম বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণসমূহ আমাদের সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে।

আচার্য ভানুভক্ত

সলীল বিশ্বাস

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে চসারের মতনই রাবেলাঁ, সার্ভান্টে, দান্তে, পেত্রার্ক, বোক্কাচিও এবং মার্টিন লুথার—ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিস, ইতালি এবং জার্মান ভাষাও সাহিত্যের উৎকর্য সাধনের সমান্তরাল গতিতে একটি স্বচ্ছ ছন্দময়তার সৌকর্য এনেছিলেন। আচার্য কবি ভানুভক্ত, ঠিক তেমনি-ই নেপালী ভাষা ও সাহিত্যে, নতুন প্রাণের ছান্দসিক গতি-রণন এনেছেন। এই অর্থে-ই আচার্য ভানুভক্ত নেপালী সাহিত্যের ইতিহাস শিলাফলকে একটি শ্রদ্ধা উৎকীর্ণ নাম।

কিন্তু এই 'নাম—গ্রন্থনায়' আমি এ কথা বোঝাতে চাইছি নে যে, যে অর্থে চসার রাবেলাঁ প্রমুখ মাননীয়, ঠিক সেই 'অর্থ মানে'ই আচার্য ভানুভক্ত স্মরণীয়। তবে, নেপালী সাহিত্যের পঠন-পাঠন অনুশীলন এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে আচার্য ভানুভক্তের শৈল্পিক-মননার মনন প্রসঙ্গে এই শ্রদ্ধের নামগুলো স্বাভাবিক ভাবেই মনে এসে যায়।

নেপাল-ভূমির পশ্চিম উপত্যকার তেহঁনের কথাকলি ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। এখানেই একদিন সেন রাজত্বের পাদভূমি গড়ে উঠেছিল। নেপালী শাসক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ-প্রতিভূ ভীমসেন থাপাও এই তেহঁনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তেহঁন শুধু রাজকাহিনীতেই স্মরণীয় নয়,—এখানের আলো হাওয়ায় বাণী-পুত্রদেরও জীবনকথা ইথার-গাঁথা হয়ে আছে। খ্যাতকীর্তি সংস্কৃতজ্ঞ, বিখ্যাত 'বসুধাভরষানন্দ' রচয়িতা পণ্ডিত শিব শর্মা এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর দিনে, এই তেহঁনের-ই রাঘমা গ্রামের একটি পরিবারে ১৮১৪-র ১৩-ই জুন আচার্য ভানুভক্ত জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাসের সেই বিবর্তিত দিনগুলোর অন্যান্য চরিত্রের মত আচার্য ভানুভক্তের জীবনকথাও একটি পরিজ্ঞাত সরলরেখায় গাঁথা নেই। কবির বিভিন্ন জীবনীকারদের গোছাল অগোছাল নানান প্রেক্ষিতের পরস্পর বিরোধী মন্তব্য মতবাদ থেকে তাঁর শৈশব দিনগুলোর অনেক প্রায়োজনিক তথ্য-ই উদ্ধার করা যায় না। আচার্যের খ্যাতিমান পৌত্র শ্রীকৃষ্ণ আচার্য কবি প্রসঙ্গে বলছেন যে,—কবি 'বারানসীধামে' শিক্ষা অর্জন এবং তাঁর প্রথম কবিতা রচনা করেন। কিন্তু কবির অন্যতম জীবনীকার মতিরাম ভক্ত কবি-পৌত্রের এই বিবরণকে স্বীকার করেন নি। তাঁর ভাষ্য অনুসারে দেখতে পাই যে,—কবি তাঁর পিতামহের কাছেই সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্র চর্চা করেন। 'পুরান কবির কবিতা'-র সম্পাদক বাবুরাম আচার্য এবং বালকৃষ্ণ শর্মাও কবিজীবনের নানান ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন।

আগেই এ কথা বলেছি যে,—আচার্য ভানুভক্ত-ই নেপালী ভাষাও সাহিত্যে আত্মর-প্রকাশের একটি অনির্বাণ গতি এনেছেন,—তবুও এই সত্যি ঐতিহাসিক যে, তাঁর জীবন ও কবিতা বিকাশের পূর্বতন দিনে নেপাল ভূমিতে আরও কিছু খ্যাতিমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। আচার্য ভানুভক্তের পূর্বসূরি শুভয়ানন্দ দাস, শক্তি বল্লভ, গুমনি পন্থ, উদয়ানন্দ, বসন্ত শর্মা, বিদ্যারণ্য কেশরী, যদুনাথ

এবং রঘুনাথ পোখরেল প্রমুখ কবিবৃন্দ সংস্কৃত, মাগধী, মৈথিলী এবং ভোজপুরীর সংমিশ্রণে গঠিত নেপালী ভাষাকেই তাঁদের সাহিত্যভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করেন এবং এই গঠনশীল ভাষাকে একটি আধুনিক রূপ দিতে চেষ্টা করেন। আচার্য ভানুভক্ত সেই অনুশীলন প্রয়াসেরই সার্থক উত্তরণ বহন করে এনেছেন। তাঁর সাধনার ফলশ্রুতিতেই নেপালী ভাষা ধ্রুপদী সাহিত্যিক এবং জাতীয় ভাষার স্তরে উন্নীত হয়েছে। তিনি-ই তাঁর ভাষাকে সারস্বত কাব্যলোক থেকে লোকযানী কথামালার গ্রন্থন রেখায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু নেপালী ভাষা প্রাথমিক স্তরে এই সকল সনাতন ভাষা ভাণ্ডার থেকেই মাত্র শরীরে উপাদান গ্রহণ করে নি;—তামাং, নেওয়ার, গুরুং, মর্গর এবং রাই-দের ভাষা, আঞ্চলিক লোকযান ও লোক-লৌকিকতা থেকেও সে ভাষা উপাদান সমৃদ্ধ হয়েছে।

নেপালী ভাষার ইতিহাস অনুস্মৃতিতে দেখা যায় যে প্রায় ছ' শ' বছরের পেছন ভূমিতে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেলেও ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দের রাজা পৃথ্বিমল্লার 'যুমলা' তামার পাত প্রাপ্তির আগে নেপালী ভাষার আক্ষরিক রূপ ধরা পড়ে নি।

আচার্য ভানুভক্ত স্বচ্ছ সাবলীল গতিতে সাহিত্য সাধনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবন-ধারা অনির্বাদ থাকলেও বিঘ্নহীন ছিল না। ১৮৪১ সালে আচার্য ভানুভক্ত তাঁর পাঁচ-সর্গে পরিকল্পিত বহু খ্যাত রচনা 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রথম সর্গ সমাপ্তকরেন, কিন্তু রচনাটি সামগ্রিক সম্পূর্ণতার পূর্বেই প্রতিকূল পরিবেশ-প্রতিবেশে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারারুদ্ধ হন।

জীবনের প্রয়োজনেই সাহিত্য—এ কথা মেনে নিলেও কোন সাহিত্যব্রতীই জীবিকার প্রয়োজনীয়তা থেকে জীবনকে সরিয়ে আনতে পারেন না। আচার্য ভানুভক্তকেও তাই জীবিকার স্বাভাবিক সর্তগুলো মেনে চলতে হয়েছিল। তিনি সমকালীন নায়ক-নাগরিক কৃষ্ণ বাহাদুরের হিসেব রক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। কৃষ্ণ বাহাদুর ছিলেন সেকালীন নেপালের প্রধানমন্ত্রী, জং বাহাদুরের ভাই। ভানুভক্তের কবি-মন হিসেব রক্ষকের গত-দৈনিক জীবনধারার সঙ্গে আত্মিক মেলবন্ধন রচনা করতে পারে নি;—ফলে, হিসেব ভ্রান্তির জন্যে অনতিবিলম্বেই তিনি অভিযুক্ত হলেন এবং এর ফলশ্রুতিতেই কারাবাস নির্দেশিত হলো।

কিন্তু তাঁর কারা জীবনের অভিশাপ আশীর্বাদের প্রশান্তিই বহন করে এনেছিল। এই কারা-অবকাশেই তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতির সৃষ্টির সুযোগ পান। ১৮৫৩ সালের বন্দী কারার দিনগুলোতে তিনি তাঁর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'এর অবশিষ্ট চারটি সর্গ রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেন। তাঁর বহুখ্যাত রচনাগুলোর মধ্যে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ছাড়া ভক্তমালা, প্রশ্নোত্তরী এবং বধূশিক্ষা অন্যতম। এ সমস্ত কাল-উত্তরী রচনা সম্পূর্ণ করেও আচার্য ভানুভক্ত আরও অনেক কবিতা পদ্য এবং গাথা রচনা করেন। এ সব রচনা নেপালের লোক জীবনকে ছুঁয়ে আছে।

আচার্য ভানুভক্তের রচনায় একটি স্বাভাবিক গতি স্বচ্ছন্দ দেখা যায়,—যা তাঁর জীবন অনুভূতির গহীন তল থেকেই উঠে এসেছে। তাঁর সৃষ্টি ঘিরে একটি সুকুমার লাবণির স্নিগ্ধতা বিরাজ করছে। তিনি তাঁর সৃষ্টি শক্তির প্রসাদে শার্দুলবিক্রীড়িত এবং শিখরিণীর মত কঠিন ছন্দকেও লোকপ্রিয় করে তুলেছেন।

নিরিড় অর্থে আচার্য ভানুভক্তের রচনা অধ্যাত্ম-বোধি নির্ভর। তাঁর আধ্যাত্মিকতা তত্ত্বমসি-বোধি চেতনা থেকেই উৎসারিত এবং তিনি 'জীব' ও 'ব্রহ্ম'-র অভেদাত্মতা স্বীকার করেন। কবি এই অধ্যাত্ম-রহস্য লোক থেকেই তাঁর রচনার প্রাণরস সঞ্চয় করেছেন;—এবং অন্য কোটিতে, একটি গভীর আধ্যাত্মিক প্রবণতা তাঁকে অধ্যাত্ম রহস্যলোক মুখীন করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর এই আধ্যাত্মিক প্রবণতা পুরাণ নন্দিত চতুর্বর্গ লাভের ঐকান্তিক বাসনা-প্রসূত নয়। আচার্য ভানুভক্তের জীবন ধর্ম এবং নেপালের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কবির এই মানস প্রবণতার স্বাভাবিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

আঠার শতকের অনতি মধ্যভাগেই এশিয়া ভূমিতে ইংরাজ বণিকের 'মানদণ্ড' রাজদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভাসকোদাগামার কালিকট তটভূমিতে অবতরণের ভেতর দিয়েই এই 'প্রতিষ্ঠা'র সূচনা সূচিত হয়। ইতিহাসের বিস্তৃত বিচরণ-চারণা না করেও বলা যায় যে, কালিকট থেকে হেসটিংস-সুজাউদ্দৌল্লার গোপন কাশী চুক্তির (১৭৭৩) সময় সংঘটনের মধ্যেই এই ইতিভাষ্য গ্রন্থিত রয়েছে।

সমকালীন ভারতীয় রাজপুরুষদের মধ্যে যখন ইংরাজ বিরোধিতার ঐক্য গড়ে তোলার সচেতনতা দেখা যায় নি, তখন নেপাল শাসক বর্গের প্রতিভূ পুরুষ ভীমসেন থাপা-ই প্রথম ভারত ও এশিয়ার রাষ্ট্রের মিলিত ঐক্য গড়ে তুলে ইংরাজ শক্তির মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন—এবং এশিয়ার মাটি থেকে তাদের নির্মূল করার পরিকল্পনাও করেছিলেন। এই পরিকল্পনা নিয়েই তিনি ভারতের মারাঠা শক্তি; রঞ্জিৎ সিংহ এবং বর্মার সমকালীন রাজশক্তির সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন। এই প্রয়াস ভীমসেন থাপার বাস্তব সচেতন রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ঐতিহাসিক প্রমাণ বহন করছে।

যদিও ভীমসেন থাপার এই আন্তরিক শুভ প্রয়াসে কোন খাদ ছিল না, তবুও তিনি অন্তিম উত্তরণ অর্জন করতে পারেন নি। ইংরাজ শক্তির সঙ্গে নেপাল রাজশক্তির সংঘর্ষের অনিবার্য মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো।

আচার্য ভানুভক্তের জন্ম বর্ষে, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সঙ্গে নেপাল রাজশক্তির যুদ্ধ অনিবার্য হলো এবং এই যুদ্ধের ফলেই ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে আপাত শান্তির প্রস্তাব নিয়ে ইংরাজ ও নেপাল রাজশক্তির মধ্যে 'সগৌলি-সন্ধি' স্বাক্ষরিত হলো।—এই সন্ধি নেপাল জাতির প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ছিল না। কিন্তু এ সত্ত্বেও বণিক ইংরাজ তার প্রতিশ্রুতি রাখে নি; ফলে ইংরাজ প্রবঞ্চনা প্রতিরোধী দৃঢ়-সংকল্প নেপাল জাতির সঙ্গে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ শক্তির আর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো। অগণিত নেপালী শহীদের তাজা কলিজার খুনে খুনে লাল পিচ্ছিল পথ বেয়ে শক্তিদম্ভী ইংরাজ এগিয়ে এলো; মৃত্যু-প্রতিশ্রুত সেই প্রতিরোধের সামগ্রিক মুহূর্তে ভীমসেন থাপা রাজপ্রাসাদ রক্ষার চেষ্টা করেও পরাজিত হলেন। এই শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি মুক্তির অন্তিম পথ হিসেবেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। রাজপ্রাসাদের পতন এবং ভীমসেন থাপার আত্মহত্যার যুগ্ম সংবাদ উৎকণ্ঠিত নেপাল জাতির জীবনে মৃত্যুর হিমবাহ নিয়ে এলো। তার পরের ইতিহাস শাসন এবং শোষণের রক্ত-নীল ধারার ইতিহাস।

এই পরিবেশ-প্রতিবেশে আচার্য কবি ভানুভক্ত অনুভব করেছিলেন যে, একমাত্র 'আধ্যাত্মিকতা'-র অনুচর্চা থেকেই জাতির হৃত শক্তি ও জনতার মানসিক চেতনা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ভানুভক্তের প্রধ্যাত 'অধ্যাত্মরামায়ণ' সমকালীন নেপালের অবস্থা প্রতিবেশের পূর্ণায়ত চিত্র-লিপি। তিনি তাঁর স্বচ্ছ-আন্তরিকতায় অনুভব করেছিলেন যে, 'রামচন্দ্র'-ই একমাত্র আরাধ্য হতে পারেন; কেননা, রামায়ণের এই মুখ্য-চরিত্র সামগ্রিক অন্যায়ের সংহারক এবং মানসিক মূল্যবোধের অনির্বাণ স্মারক। সমকালীন নেপাল মানসিকতায় এমনি একটি অপরাজেয় শক্তির উৎস থেকে প্রেরণা লাভের প্রয়োজন অনিবার্য ছিল। সুতরাং জাতীয় প্রয়োজনের প্রেরণাই আচার্য ভানুভক্তকে অধ্যাত্মবোধের রহস্যলোক মুখীন প্রবণতায় প্রাণিত করেছে। তাই তাঁর রচনাবলী নেপালী ভাষা ও সাহিত্যে কেবল আধুনিকতার সুরই ধ্বনিয়ে তোলে নি; নেপালের জাতীয় জীবনে একটি সচেতন রাজনৈতিক ঐক্যের ইস্পাতী কাঠিন্য ও সংহতি এনেছে।

আচার্য ভানুভক্তের সাধারণ রচনাগুলি তাঁর সমকালীন সমাজ-মানসিকতার পরিচয় বহন করে। সমকালীন সামাজিক অসাম্য সম্পর্কে তিনি ক্ষুরধার সমালোচক ছিলেন। তদানীন্তন 'রাণাশাহী'র সামান্যতম অপরাধকেও তিনি ক্ষমার চোখে দেখেন নি। তবে অন্যায়-সমালোচনার প্রবণতা তাঁর ছিল না। সামাজিক মানুষের কল্যাণ সাধনাই তাঁর সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল। এই স্বার্থ-মুক্ত মানসিকতা তাঁর রচনার একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য এনেছে এবং রচনার এই গুণটি তাঁকে অন্যান্য রচনা থেকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছে।

আলোচনার অন্তিমে আচার্য ভানুভক্তের রচিত একটি হাস্যরসাত্মক কবিতার বাংলা অনুবাদ তুলে দিচ্ছি। আমার শ্রদ্ধা পরম আচার্য শম্ভু ঘোষ অনুবাদটির পরিমার্জনা করেছেন। 'উইট, হিউমার এবং সারকজমের' সংহত সমন্বয়ে কারাগারের নির্জন 'সেলে'র জাতক কবিতাটিতে কবি ভানুভক্তের চরিত্রের একটি বিশিষ্ট চিত্র নিহিত আছে বলেই মনে করি,—

হে আমার বিধাতা,
প্রতিদিন আমি তোমার এমন
জীবন্ত স্পর্শ লাভ করি!
তাই এ-মন কখনও পীড়িত নয়।
কোন মূল্য না দিয়েই,—বিরামহীন,—
আমি এক নৃত্যের আনন্দের
প্রসাদ লাভ করি;—

মশা এবং মাছি এবং ছারপোকা
এরাই আমার রাত্রির সঙ্গিনী;—
মশার সঙ্গীত এবং
মাছির নাচ—
তার-ই আনন্দ
আমি অবিরাম উপভোগ করি।

(ইংরাজী থেকে অনূদিত)

আচার্য ভানুভক্তের কবি চরিত্র আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, তিনি-ই আধুনিক নেপালের শ্রেষ্ঠ কবি এবং কেবলমাত্র পনের মিলিয়ন নেপালী ভাষাভাষী মানুষের জীবন সীমানায় তাঁর পাঠক-সীমা সীমিত নয়,—বিশ্বের অন্যান্য ভাষাভাষী অগণিত কাব্য-রসপিপাসুদল নেপালের নব-জাগরণের অগ্রপথিক ও আধুনিক রূপকার আচার্য কবির কবিতার অনুরাগী পাঠক।

ন্যাশনাল থিয়েটার ও তার নেপথ্য-নায়ক মধুসূদন

পুলিন দাশ

নাট্যজগতে মধুসূদনের আবির্ভাব যেমন আপতিক, অভূর্ধানও তেমনি আকস্মিক। এ অঞ্চলে তাঁর অবস্থানও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই ক্ষণচর্চাতেই বাংলার নাট্যলোককে তিনি যা দিয়ে গেছেন তার মূল্য অপরিসীম। যে কথানি নাটক প্রহসন তিনি লিখে গেছেন তদানীন্তন বাংলা নাটকের সঙ্গে তুলনায় তারা অসাধারণ। ভাবীকালের বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পথিকৃতের।

মধুসূদনের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই কি তাঁর হাতে বাংলা নাটকের এই অভাবিত সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ? অনেকাংশে হয়তো তাই মনে হবে। কিন্তু পাদপ্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত এই সাফল্যের অন্তরালে যে একটা সদাতৎপর নাট্যচিন্তার নেপথ্যলোকও বিরাজিত ছিল একথা ভোলা ঠিক হবে না। দেশবিদেশের নাট্যসাহিত্য মন্থনজাত একটা স্বতন্ত্র নাট্যবোধে উদ্বোধিত মনন অধিকার অর্জন এবং তার আলোকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন জাতীয় নাটক রচনার উপযোগী সৃষ্টিশীল নাট্যচিন্তানির্মাণ মধুসূদনের নাট্যকর্মের নেপথ্যবিধান। জাতীয় আশা বাসনার পরিপূরকরূপে নাটককে দেখতে চেয়েছিলেন মধুসূদন। স্বভাবত তাই 'ন্যাশনাল ড্রামা', 'ন্যাশনাল থিয়েটার' কথাগুলি প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল মধু-কণ্ঠেই। উচ্চারণ মাত্র নয়,—তাঁর নাট্যচিন্তায় ও সৃষ্ট নাটকের মাধ্যমে মধুসূদন জাতীয় নাটক ও জাতীয় নাট্যশালার উপযোগী উপকরণ উপাদান সংগ্রহ করে দিয়ে গেলেন। যার সফল পরিণতি ঘটল ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায়।

'রত্নাবলী'র অভিনয় দর্শনে তৎকালীন 'অলীক কুনাট্যের' প্রতি মধুসূদনের অনীহা এবং ভালো নাটক সৃষ্টি করে নাট্যরস-পিপাসা নিরাকরণের প্রেরণায় লেখেন 'শর্মিষ্ঠা নাটক'। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৫৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হল শর্মিষ্ঠা। বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতাদের আমাদের উদীয়মান 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' আদি সংগঠক সুহৃদ বলে বর্ণনা করে শর্মিষ্ঠার অভিনয় প্রসঙ্গে মধুসূদন লিখলেন—'Sarmistha is to be acted at the elegent private theatre attached to the Belgachia villa of the Raja of Paikpara. Should the drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen—the earlist friends of our rising National Theatre.'

দেখা যাচ্ছে নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশের সেই আদি মুহূর্ত থেকেই ভারতবর্ষে নাটকের পুনরভ্যুদয় মধুসূদন মানসের অভিষ্ট। নাটকের উৎকর্ষ মঞ্চের উৎকর্ষের উপর যেহেতু নির্ভরশীল সেই জন্য জাতীয় নাটক জাতীয় নাট্যশালাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠতে পারে এই প্রত্যয় থেকে মধুসূদন জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের সূচনা যাঁরা করে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পাইকপাড়ার রাজাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

জাতীয় নাট্যশালা বা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' সম্পর্কে মধুসূদনের প্রার্থনা পূর্ণতায় পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল আহীরিটোলার রাধামাধব হালদার ও যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্যে। ১৮৬০ সালের গোড়ার দিকে 'দি ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার' নাম দিয়ে তাঁরা একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অনুষ্ঠান পত্রও প্রচার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা অবশ্য ফলপ্রদ হয়ে ওঠে নি। এই বিফল প্রয়াসকে সফল করে তোলার আহ্বান ঘোষিত হল সোমপ্রকাশ-এর পৃষ্ঠায়। ১৮৬২ সালের ১২ই মে সোমপ্রকাশে লেখা হল—'...আমাদের পূর্বতন অভিনয়াদি পুনরুজ্জীবিত হউক।...শ্রীযুক্ত রাধামাধব হালদার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উৎসাহ বিরহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুনর্বার তাহাদের এ বিষয়ে চেষ্টাবান হওয়া উচিত।'

১৮৬৮ সালে আগষ্টের নব প্রবন্ধে এই আপ্রহেরই পুনরাবৃত্তি—

'আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করি, যে তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, কোন একটা প্রকাশ্য স্থানে নাট্যমন্দির প্রস্তুত করুন, বেতনভোগ নটনটী রাখুন, এবং নির্দিষ্ট টিকিট বিক্রয় করুন, তাহা দ্বারা অভিনয়ের সুদায় ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে, উদ্ধৃতন হইয়া অভিনয় খাতায় জমা হইলে ক্রমশঃ অভিনয়ের উন্নতি হইতে পারিবে।'

পয়সার কথা উঠলেও অভিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে পয়সা রোজগারই জাতীয় নাট্যশালার লক্ষ্য এমন কথা নবপ্রবন্ধের লেখক নিশ্চয়ই বলতে চান নি। সখের নাট্যশালাগুলির অনিশ্চয় স্থিতিতে আতঙ্কিত লেখক প্রস্তাবিত নাট্যশালাগুলির স্থায়িত্বের কথা ভেবেই টিকিট বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাগবাজারের সেই স্বদেশীয় যুবকগোষ্ঠী যাঁরা ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য এই সব আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন নাটক দেখিয়ে নিছক পয়সা রোজগার তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। ১৯ নভেম্বর, ১৮৭২ সালের 'হুলভ সমাচার' পত্রিকায় যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন তাঁরা খুব স্পষ্ট ভাষায় সেখানে তাঁদের লক্ষ্য ও আদর্শ প্রতিফলিত—'সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা আগামী ৭ই ডিসেম্বর শনিবার তারিখে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মল্লিকের বাটীর সম্মুখে মৃত মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটীতে বঙ্গভূমির ও বঙ্গভাষার অঙ্গপুষ্টির নিমিত্ত রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছুক ও যত্নবান হইয়াছি। সেদিন নীলদর্পণের অভিনয় হইবে।' ইংলিশম্যান্ পত্রিকার ১৮৭২ সালের ২০শে নভেম্বরে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এর সমর্থন মিলবে—

'A far native gentleman, residents of Bagh Bazar, have established a Theatrical Society, their object being to improve the stage, as also to encourage native youths in the composition of new Bengali Dramas from the proceeds of sales of tickets. The attempt is laudable one, and is first of its kind.

১৮৭২ এর ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নীলদর্পণের অভিনয় মাধ্যমে ন্যাশনাল থিয়েটার এর আত্মপ্রকাশকে আরো অনেকের সঙ্গে ন্যাশনাল পেপার-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র স্বাগত জানালেন 'The event of National importance' বলে।

জাতীয় রঙ্গালয়ের পৌরকতা জাতীয় জীবনের সঙ্গে সুগভীর আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে জাতীয় নাটক আর তার ফলে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সমুন্নতি সাধিত হবে—মধুসূদনের

এই বাসনারই যেন রূপায়ণ ঘটল সেদিনের 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' উদ্বোধনের ভিতর দিয়ে।

মধুসূদনই প্রথম বাস্তব ও কিঞ্চিৎ কটু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন জাতীয় নাট্যশালার আশ্রয় আনুকূল্য না পেলে জাতীয় নাটক কখনো রচিত হতে পারে না। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের রুচিকে তুষ্ট না করতে পারলে ধনীর গৃহের সখের থিয়েটারে নাটকের জায়গা মেলা কঠিন। অথচ গতানুগতিক রুচির তোষণেই নাটকের দায়িত্ব অবসিত হওয়া সমীচীন নয়। দর্শক-রুচিকে অভীষ্ট পথে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্যেই নাটকের মুক্তি।

শর্মিষ্ঠা এই লক্ষ্যের পথে মধুসূদনকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। শর্মিষ্ঠা সম্পর্কে মধুসূদন যে মন্তব্য করেছেন'···first attempt in the Bengali language to produce a classical and regular Drama' তা ঠিকই। বাংলা ভাষায় ক্রপদী রীতির রীতিমত নাটক লেখার আদি প্রয়াস শর্মিষ্ঠা নাটক সন্দেহ নেই। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলা এই নাটকে ওই প্রয়াস যে সর্বাংশে সার্থক হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। মধুসূদনও এ বিষয়ে সচেতন। শর্মিষ্ঠা শেষ করে প্রহসন দুখানি লেখার পরে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন—

'You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound of classical Dramas to regulate the national taste···'জাতীয় রুচিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, গড়ে তুলতে পারে, এমন নাটকের অভাব অনুভব করেছে মধুসূদনের অতৃপ্ত শিল্পীচেতনা।

শর্মিষ্ঠাকে সংস্কৃতরীতি অনুসারে পুনর্লিখনের যে পরামর্শ পেয়েছিলেন রামনারায়ণের কাছ থেকে সরাসরি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মধুসূদন। স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন সংস্কৃত রচনামাত্রেরই অন্ধ দাসত্ব তিনি করবেন না। তিনি নাটক রচনা করছেন সেই সব পাঠক দর্শকদের জন্য যারা মধুসূদনের অনুরূপমনস্ক, পাশ্চাত্যচিন্তা আর পাশ্চাত্যের ভাবধারায় যাদের মন পরিপুষ্ট। কাজেই তাঁর নাটকে মধুসূদন যাকে বলেছেন 'foreign air' সেই বিদেশী হাওয়া প্রবলভাবে প্রবাহিত হবে। হয়েছে তাই শর্মিষ্ঠায়। আবার এই বিদেশী হাওয়ার সঙ্গে শর্মিষ্ঠায় সংস্কৃত নাটকের রীতি পদ্ধতি বিবর্জিত হলেও সংস্কৃত নাটক, বিশেষ করে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ছায়া মিশে গেছে।

আসলে মধুসূদনের নিজস্ব নাট্যচিন্তা একটা সুসংবদ্ধরূপে তখনো গড়ে উঠতে পারে নি। গ্রীক কাহিনীর ভারতীয় বেশে আশ্চর্য সুন্দর রূপান্তর সত্ত্বেও পরবর্তী নাটক পদ্মাবতীতেও তা হয় নি। তবে শর্মিষ্ঠা রচনার সময়েই মধুসূদন ঠিক করে নিয়েছিলেন যে পরিচ্ছন্ন প্রোজ্জ্বল নাট্যভাবনায় উদ্ভাসিত মোহনীয় প্লট, সুসমন্বিত চরিত্রচিত্রণ আর ব্যাকরণবিশুদ্ধ ভাষার সমাবেশে নাটককে সার্থক করে তোলা সম্ভব। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ নাটককে মডেল হিসেবে গ্রহণ করলেও তাদের কাছে নির্বিচার আত্মসমর্পণও যে অনুচিত একথাও সেই সময়ই তিনি ভেবেছিলেন। বিদেশের কাছ থেকে ঋণগ্রহণের বিষয়ে তাঁর মত—

'I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.' মূল পরিচ্ছদটি রচনায় যদি বাইরে থেকে উপকরণ আহরণে স্পষ্ট অনিচ্ছা তাহলে কোন উপাদানে তাকে

নির্মাণ করা হবে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করার জন্য মধুসূদনকে নাট্যাঙ্গিকের প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। কৃষ্ণকুমারী রচনার সমসময়ে এই চিন্তায় গভীরভাবে নিমজ্জিত মধুসূদন। সেইকালে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে এই চিন্তার ইতিবৃত্ত।

এই চিন্তাসূত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্লট, চরিত্র, সংলাপ, অভিনেয়তা প্রভৃতি নাটকের প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবেছেন তিনি এবং এদের প্রয়োগযোগ্য আদর্শরূপ নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। পাশ্চাত্য নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির প্রতি মধুসূদনের স্বাভাবিক আকর্ষণ। ভারতীয় নাটক সম্পর্কে তাঁর ধারণাও অযথার্থ নয়—যে ভারতীয় নাটক "dramatic poems" অর্থাৎ নাটকের আধারে কাব্য। কাব্যধর্মী প্রাচ্য নাটকের পুনরুজ্জীবন আদৌ সঙ্গত বলে তাঁর মনে হয় নি। নাটকের আলঙ্কারিক সূত্রাবলীকে পূর্বেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্যদিকে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের, তাঁর ভাষায়, 'stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment' তাঁকে মুগ্ধ করে প্রলুব্ধ করে। এই প্রলোভন সত্ত্বেও পাশ্চাত্য নাটক আর নাট্যসূত্রাবলীর হুবহু অনুসরণকেও অভিপ্রেত বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রতিটি পদক্ষেপে রাস্তা তাঁকে তৈরী করে চলতে হয়েছে।

ইউরোপীয় নাটকের প্যাসানের যে তীব্রতা দীপক রাগে বাজে তার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণে মধুসূদন মুসলমানী কাহিনী নিয়ে নাটক লেখার পরিকল্পনা করেন। মুসলমানরা তাঁর মতে 'fiercer race'। তাদের কাহিনীর নাট্যরূপে তিনি ইউরোপীয় নাটকের অনুরূপ 'heroism of sentiment'কে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ পাবেন। মধুসূদনের শিল্পী মানস উল্লাস ভোগ করতে আগ্রহী অনুরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু মধুসূদনের সামাজিক চেতনাও সতর্ক হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। ইউরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একটা প্রভেদ তাঁর সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ইউরোপের নাটকে যে হৃদয়াবেগের প্রবণতা, তীব্র দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ আর প্রলয় ঝড়ের গর্জন প্রতিধ্বনিত ওখানকার সমাজেই তার অস্তিত্ব ছিল। তাই ওখানে তা স্বাভাবিক। মধুসূদন দেখলেন তাঁর দেশ-কালের পরিস্থিতি এমন যে হৃদয়ধর্মে যদিও বা তাঁর দেশবাসী আর ইউরোপীয়দের মধ্যে ভেদ নেই তবু তার প্রকাশের ভঙ্গি উভয়ত পৃথক। কাজেই ইউরোপের নাটকের মতো করে বাংলা নাটক রচনা করতে যাওয়া অসঙ্গত, অসমীচীন। বাংলা নাটককে লেখককে দেশকাল আর তার সামাজিক অবস্থার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। এই স্বীকৃতির বন্ধনে হয়তো মধুসূদনের শিল্পীসত্তা পীড়িত বোধ ক'রেছে কিন্তু এই বাঁধনই তাঁকে মুক্তি দিয়েছে জাতীয় নাটক আর জাতীয় নাট্যশালার আদর্শ আবিষ্কারের পথে। 'I write under very different circumstaces. Our social moral developments are of different charactor'. আমাদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা ইউরোপের থেকে স্বতন্ত্র এই সত্যকে অঙ্গীকার করে নিয়ে তিনি নিজের পথে অগ্রসর হয়ে গেছেন। বলেছেন—'I have certain dramatic notions of my own, which I follow invariably'। তাঁর একান্ত আপন নাট্যবোধ আর তাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা নাট্যসূত্রাবলী যাকে তিনি অতঃপর অনুসরণ করেছেন তাঁর ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে জাতীয় নাটক আর জাতীয় নাট্যশালা।

কৃষ্ণকুমারী নাটককে উদ্দেশ্য করে মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে জানান—'If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation stone of our National Theatre.' আমাদের জাতীয় নাট্যশালার ভিত্তি রচনা করে দেবে কৃষ্ণকুমারী এই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি নাটকখানি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীতে তাই দেখা যাবে নাট্যকার প্রাচ্য পাশ্চাত্যের কোন বিশেষ দেশের বিশেষ নাটক নয়, জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যা তাকে ভারতীয় পরিবেশে স্বদেশ ও স্বসমাজের প্রকৃতি অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ করে পরিবেশনের চেষ্টায় নিমগ্ন। সংস্কৃত নাটকের কাব্যময়তা যার অবশেষ তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটকেও কিছুটা অনুপ্রবেশ করেছিল তার যত্নকৃত বিবর্জন ঘটেছে এখানে। পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মতো পাশ্চাত্য নাটক বা নাট্যরীতির অলস আক্ষরিক অনুকরণের পরিবর্তে পাশ্চাত্য নাটকের মর্মাদর্শটুকুকে গ্রহণ করে জাতীয় জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত দ্বন্দ্বমুল একটা কঠিন বন্ধুর ভূমির উপর এনে নাটককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। জাতীয় নাট্যশালার দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে নাটক।

নাটকের প্রতিটি অঙ্গকে কেমন করে প্রসাধিত করেছে মধুসূদনের এই চিন্তা কৃষ্ণকুমারী নিয়ে কিছুটা আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হবে। কৃষ্ণকুমারী রচনার সময়ে মধুসূদন মানসে এউরিপিদেস বা সেক্সপীয়র-এর উপস্থিতি অনুভব করা যায়। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী নাটকের চরিত্র চিত্রণে ভারতীয় আদর্শেরই অনুবর্তন ঘটে। 'The position of European, both dramatically as well as socially are very different'—সামাজিক দিক থেকে এবং ফলত নাটকীয় দিকথেকে ইউরোপের সঙ্গে ভারতীয় নারীর এই প্রভেদ চেতনা নিয়ে তিনি কৃষ্ণকুমারী নাটকের নারী চরিত্র চিত্রণে অগ্রসর হয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর ভালোবাসা তাই উন্মাদনার অতিশায়িতায় গিয়ে পৌঁছোয় না। পরিবার পরিজনের মর্যাদা রক্ষার মহৎ প্রশ্নসংকটই তাকে মৃত্যুমুখী করে তোলে। অন্তর্দাহের অগ্নিগ্রাসী বিস্ফোরণের তীব্র জালাময় পরিণামের পরিবর্তে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ঘনিয়ে তোলে একটা অশ্রুবিধৌত সংযত বিষাদ। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতির সূত্রেই রাণী অহল্যাকে কোনোক্রমেই আগামেমনন জায়া ক্লাইটেমনেষ্ট্রার সমগোত্রীয় করে তোলেন নি মধুসূদন যদিও এউরিপিদেসের ইফিগেনিয়া নাটককে নানাভাবে স্মরণ করেছেন তিনি কৃষ্ণকুমারী নাটকের পরিকল্পনায়। বিলাসবতীর আত্মীয়তা অনেকাংশে যদিও মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার সঙ্গে কিন্তু পুরোপুরি বসন্তসেনাও সে না। আর মদনিকা—মধুসূদনের 'ফেভরিট' ও ভারতীয় আদর্শেই সৃজিত। 'ধনদাস, আমি ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়।'—প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত ধূর্ত ধনদাসের প্রতি মদনিকার এই উক্তি ইয়াগো, শাইলক লেডি ম্যাকবেথ কাউকেই স্মরণ করায় না। মমতাময়ী নারীহৃদয়ের করুণাধারার অকপট প্রকাশই বরং সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয় নাটকের ভিত্তির স্থপতি মধুসূদন তাঁর দায়িত্বের অপর অংশ সম্পর্কেও সমান সচেতন। দর্শকরুচির পোষকতা কেবলমাত্র নয়, অভীষ্টপথে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার দায়ও যে তাঁর। অতএব প্রচলিত আদর্শের রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত আদর্শের বীজও তাঁকেই বপন করে দিতে হবে দর্শক পাঠক মনে। চিরন্তন নারীহৃদয়ের অস্তিত্ব মহিমায় ভাস্বর বারবণিতা মদনিকা হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধার পাত্রী। ভারতীয় আদর্শকে আহত

না করে নারীর প্রতি নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবোধের অনুগামী নারীচরিত্রসৃষ্টির সূচনা করে দিয়ে গেছেন মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে মদনিকার চরিত্রে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলিও মধুসূদনের এই একান্ত নিজস্ব নাট্যচিন্তার ফল। তাই রাজা আগামেম্নন-এর প্রচণ্ড প্রতাপের অগ্নুৎপাত বা লীয়রের নিষ্ফল পরিতাপের বিশাল বিক্ষোভ রাজা ভীমসিংহে অনুপস্থিত। বিপন্ন স্বাধীনতা স্বদেশের সংকটমোচনের চিন্তায় নিরুপায় রাজা নিয়তি নির্দিষ্ট অমোঘ পরিণামের দিকে অসহায়ভাবে এগিয়ে যান। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের থেকে ধনদাস যেমন পৃথক, তেমনি সে আবার ইয়াগোও নয়। কিংজন নাটকের ব্যাষ্টার্ড-এর কথা ভেবে যদিও বলেন্দ্র সিংহ অঙ্কিত তবু ব্যাষ্টার্ড-এর সঙ্গে তার পার্থক্যও প্রচুর।

'অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনো এদেশে এত পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য যে আমাদের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি, অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন।' নাট্যসংলাপ রচনায় অমিত্রাক্ষরের সামর্থ্য আর অমিত্রাক্ষর রচনায় নিজের অর্জিত অধিকার সম্পর্কে নিসংশয় হওয়া সত্ত্বেও কেন মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে অমিত্রাক্ষর সংলাপ রচনা করেন নি তা মধুসূদনের উপরে উদ্ধৃত উক্তি থেকে বোঝা যাবে। সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির সংলাপ অমিত্রাক্ষরে রচিত। আর মেঘনাদবধ কাব্যকে নাট্যরূপ দেবার সময় গিরিশচন্দ্র এই অমিত্রাক্ষরকে ভেঙ্গে নাট্যসংলাপের একটা বিশেষ রূপ দিয়েছিলেন বাংলা নাটকের সংলাপ রচনার মাধ্যমরূপে যার বহুল ব্যবহার ঘটেছে পরবর্তী সময়ে 'গৈরিশছন্দ' নামে। এসব সত্ত্বেও কৃষ্ণকুমারীর সংলাপ রচনায় মধুসূদনের চিন্তা স্বতন্ত্রপথবর্তী। প্রত্যেক জাতির প্রাত্যহিক জীবন আচরণে লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু স্বতন্ত্র নিজস্ব বুলি গড়ে ওঠে। তার উপরে ভিত্তি করে নাট্যসংলাপ রচনার আদর্শকে অনুসরণ করেছেন মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে।

সব থেকে লক্ষ্য করার বিষয় জাতীয় নাটক রচনা করতে বসে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীতেই প্রথম জাতীয় ভাবনার উৎসার ঘটিয়েছেন। স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ ঘটল প্রথম কৃষ্ণকুমারী নাটকে। 'ভগবতি, এ ভারতভূমিতে কি আর সে শ্রী আছে। পূর্বকালীন বৃত্তান্ত স্মরণ হলো, আমরা যে মনুষ্য, কোনমতেই তা বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি না। হায়, হায়। যেমন কোন লবণাম্বু তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এদেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ হতে কখনও অব্যাহতি পাব না।' ভীমসিংহের এই উক্তিতে পরাধীনতার আপদ থেকে উদ্ধারের বাসনা প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল নাটকে। জাতীয় বাসনার রূপায়নের পথে জাতীয় নাটকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে দিয়ে গেলেন মধুসূদন তাঁর নাটকে। এই জাতীয়-বাসনার সুস্পষ্ট উচ্চারণ অতঃপর বাংলা নাটকের অন্যতম লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ায়। যার বিদ্রোহাত্মক নিনাদে ভীতচকিত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়েছিল অচিরেই আইন পাশ করে নাট্যশালার কণ্ঠরোধ করতে। স্বাধীন নাট্যচিন্তায় আর তার সফল রূপায়ণে কৃষ্ণকুমারীতে মধুসূদন যে আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তারই

উপরে ১৮৭২এ এসে রচিত হল জাতীয় নাট্যশালার সৌধ। আর তার চারবছরের মধ্যে ১৮৭৬ সালে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন সপারিষদ গভর্ণর পাশ করে নিলেন। আইনের ধারায় ঘোষিত হল সেই সব নাটকের প্রদর্শন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে যে নাটক—'likely to excite feeling of disaffection to the Government established by law in British India [or British Burma']—The Dramatic Performance Act, 1876, cl 3 (c).

বাংলা নাটকের ইতিহাসে মধুসূদনই প্রথম মঞ্চসচেতন নাট্যশিল্পী সমসময় ও সমাজের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে কী ভাবে তিনি তাঁর নাট্যাদর্শ রচনা করেছিলেন এবং তদনুসারে নাটক রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন কৃষ্ণকুমারীর আলোচনা প্রসঙ্গে তার কিছুটা পরিচয় আমরা পেয়েছি। অপরপক্ষে মঞ্চের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগের সূচনা বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী নাটকের অভিনয় কাল থেকে ক্রমশ তা নানাদিক থেকে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সংযোগরক্ষাকরী সেতুস্বরূপ। কেশবচন্দ্রের নাট্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত মধুসূদন তাঁকে গ্যারিকের সমকক্ষ অভিনেতার মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নি। আবার সেই কেশবচন্দ্রের কাছ থেকে যখন কৃষ্ণকুমারী নাটকে সাব-প্লট' সংযোজনের উপদেশ আসে মধুসূদন তাকে প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে 'it will require two more females,' স্ত্রীভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অতিরিক্ত দুজন অভিনেতা সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠবে মঞ্চাধ্যক্ষের কাছে একথা বুঝেছিলেন।

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য শরচ্চন্দ্র ঘোষ যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উমেশচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত সামশ্রমীকে নিয়ে মধুসূদন ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। স্থায়ী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে মধুসূদন সেখানে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী নেবার পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা কমিটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন তবু একথা উল্লেখযোগ্য যে মধুসূদনের আগ্রহ অনুসারে সেদিন স্ত্রীলোকের দ্বারা স্ত্রীভূমিকা অভিনয়ের যে ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল এর পর থেকে অভিনেত্রী ব্যতীত পেশাদার মঞ্চ চলেনি।

মধুসূদন সব সময়ই চেয়েছিলেন তাঁর নাটকের মঞ্চায়ন ঘটুক। তাঁর প্রহসন দুখানি অভিনীত না হওয়াতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তিনি। অভিনেয়তা গুণ আর নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষ মঞ্চনির্ভর একথা জানতেন তিনি। ন্যাশনাল থিয়েটার-এর দ্বারোদ্ঘাটন মধুসূদনের নাটক দিয়ে হয় নি একথা ঠিক। তাঁর উপস্থিতিও সম্ভবপর হয়নি এই আয়োজনের মুহূর্তে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ন্যাশনাল থিয়েটার-এর জন্মের অব্যবহিত পরেই ন্যাশনাল আর হিন্দু-ন্যাশনালে দুভাগ হয়ে পড়ার পর পুনরায় যখন এই দুই দল সম্মিলিতভাবে অভিনয়ের আয়োজন করেন সেদিনের আকর্ষণ ছিল মধুসূদনেরই কৃষ্ণকুমারী নাটক। মধুসূদনের অনাথ সন্তানদের সাহায্যকল্পে ১৮৭৩ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার-এর নিজস্ব মঞ্চগৃহ ছিল না। বেঙ্গল থিয়েটারই প্রথম রঙ্গমঞ্চ যার নিজস্ব মঞ্চগৃহ ছিল। মধুসূদনের মায়াকানন নাটক দিয়ে

বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটনের কথা ছিল কিন্তু মধুসূদনের অকালমৃত্যুতে তা আর হয়ে ওঠে নি। বেঙ্গল থিয়েটার-এর সূচনা হল শর্মিষ্ঠা নাটক দিয়ে ১৬ই আগষ্ট, ১৮৭৩ সালে।

মধুসূদনের স্বপ্ন ও সাধনা এই ভাবে একাত্ম হয়ে রইল জাতীয় নাটক আর জাতীয় নাট্যশালার সঙ্গে। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখেছিলেন মধুসূদন—

'Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may be associate my humble name with yours.'

জাতীয় নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস রচনায় ভাবী ঐতিহাসিকের দ্বারা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তার নামও একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে মধুসূদনের এই বিনীত প্রার্থনা জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পরে আজকের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেবেন বলেই আশা করা যায়। নামটুকু উচ্চারণ করেই হয়ত তুষ্ট হতে পারবেন না; ঘোষণা করতে হবে মধুসূদনকে জাতীয় নাট্যশালার নেপথ্য নায়করূপে।

লোকবৃত্তের স্বপক্ষে

শঙ্কর সেনগুপ্ত

এক একজন পণ্ডিত এক একভাবে ইংরাজী 'ফোকলোর' শব্দের অনুবাদ করেছেন। কেউ বলেছেন লোকবিদ্যা, কেউ বলেছেন লোকযান, অন্যে বলেছেন লোকবার্তা। তাছাড়া লোকশ্রুতি, লোকচর্যা, লোকবিজ্ঞান, লোকায়ন, লোককৃতি, লোকলোর, লোকবাঙ্ময়, লোকতত্ত্ব, লোকায়ত, লোকপরিচয়, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হচ্ছে 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে আমাদের প্রস্তাব লোকবৃত্ত এই শব্দটির সমর্থনে দু'একটি কথা নিবেদন করা যেতে পারে।

এই নিবেদনের উদ্দেশ্য সংজ্ঞা তৈরী নয়, বিষয় বা শব্দটিকে গভীরভাবে জানার উদ্দেশ্যে এর চারিত্র বিশ্লেষণে সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে যে কোন অনুবাদ বা সংজ্ঞা জোর করে কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, জন প্রয়োগের মারফৎ আসে তাদের স্বীকৃতি। সে দিক থেকে 'লোকবার্তা' হিন্দী জগতে জনপ্রিয়, শব্দটি হিন্দী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে টিকে গেল, বাংলায় লোকযান বেশ কিছু গুণীজনের সমর্থন পেয়েছে। তাই এখান থেকে এমন গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার নাম 'সীমান্ত বাংলার লোকযান।' এখান থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের নাম 'ভারতীয় লোকযান'। এবং এ শব্দটির নির্মাতা এমন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষী যিনি আধুনিক বাংলা তথা ভারতীয় বিদ্বৎ সমাজের মধ্যে বিদ্বত্তম। আমরা আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছি, ডক্টর সুনীতিকুমার প্রবর্তিত শব্দটি এখনও সর্বজন স্বীকৃতি পায় নি। পায়নি বলেই নানাজন নানাভাবে শব্দটির অনুবাদ করে চলেছে। এবং এই নানাজনের এই ভীড়ে আমরাও একটি শব্দ নিয়ে দাঁড়িয়েছি জন স্বীকৃতি বা সমর্থনের আশায়, জনস্বীকৃতি বা জন প্রয়োগে টিঁকে না গেলে শব্দটি হারিয়ে যাবে। তখন আমরাও স্বীকৃত শব্দটিকে গ্রহণ করে প্রস্তাবিত শব্দ বর্জন করতে রাজী থাকব। কারণ, আমরা সামাজিক জীব। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদেরকে সংযুক্ত রাখতে ও মানিয়ে নিতে চাই বৈ কি!

'ফোকলোর' বা 'লোকবৃত্ত' বলতে আমরা কি বুঝি, শব্দটি কর্ণগোচর হবার সঙ্গে সঙ্গে কোন চিত্রকল্প আমাদের চোখের উপর ভেসে ওঠে, শব্দটির কোন মাধুর্য বা আকর্ষণ অথবা বৈজ্ঞানিক চারিত্র আমাদের নিজেদের হারিয়ে ফেলতে ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মত কিছু একটা খুঁজে বেড়াতে উৎসাহিত বা চালিত করে তা নিবেদন করার উদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা, লোকবৃত্তের শাখা-প্রশাখা উপশাখা তথা কথা-ছড়া নাচ-গান, প্রবাদ, ধাঁধা, ব্রত আচার, আচরণ, অনুষ্ঠান, শিল্প-কলা ক্রীড়াদির একটি তালিকা পেশ করলে পাঠক সহজেই বিষয়ের গভীরতা ও ব্যাপকত্ব উপলব্ধি করতে পারতেন। কিন্তু এই মুহূর্তে এরূপ কোন তালিকা পেশ না করেও আমরা বিষয়টির ভাবনায় পাঠকদের একটু সময় কেড়ে নিতে পারি।

নতুন করে উচ্চারণের দরকার নেই যে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের নিঃস্ত সংহতিবোধ যে কোন জাতীয়তাবাদের ভিত্তি, শক্তির উৎস, জাতীয়সত্তার ঐতিহাসিকরূপ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য, বিশ্বসমক্ষে তাকে উদ্ভাসিত করার জন্যই লোকবৃত্ত গবেষণা তথা সত্যানুসন্ধান। কারণ

লোকবৃত্ত ঐতিহ্যভিত্তিক সৃষ্টি বা কালের প্রবাহ অতিক্রম করে জীবিত ও বস্তুতে শিল্পে এবং সাহিত্যে প্রতিরূপিত, এবং মুখে মুখে সৃষ্ট, মুখে মুখে স্থিতিশীলতাপ্রাপ্ত, দেখে দেখে উত্তরাধিকার সূত্রে রচিত উপাদান। এই উপাদানের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে লোকজ্ঞান ও মনীষার সবকিছু। তাই আত্মপ্রচারের জন্য নয়—সত্য ন্যায় ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাকল্পে, জনজীবন উপলব্ধিকল্পে লোকবৃত্ত চর্চা তথা গবেষণা, বৈজ্ঞানিক অনুশীলন, বিজ্ঞানের রাজ্যে কোন কল্পনা-বিলাস বা প্রচারধর্মী আচরণের অবকাশ নেই, সত্য কথন, বস্তু নিষ্ঠা তথ্য এবং বিচার বিশ্লেষণ লোকবৃত্ত চর্চার ভিত্তি। মানুষের চিন্তা, চেতনা কর্মপ্রয়াস, ক্রমবিকাশ ও সভ্যতা বিবর্তনের ধারা এবং মানব অভিব্যক্তির সবকিছু লোকবৃত্ত গবেষকের অধ্যয়নের বিষয়। তার মধ্যে আছে ইতিহাস তথা ইতিবৃত্ত, আছে বৃত্তি ও সমাজ সম্পর্কিত বৃত্তান্ত।

মানব ইতিহাস সম্পর্কিত বর্তমান ধারণা বা চেতনা প্রাচীনযুগের মানুষের ছিল না। তাই তখন দেব-দেবীর কথা ও কাহিনী, রাজ-রাজরাদের যুদ্ধ সন্ধি জয় পরাজয়ের বৃত্তান্তই ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এবং বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর কথা, তাঁদের সুখ দুঃখ, আচার-আচরণ, অসন-বসন, কর্মকৃত্যাদি সেখানে স্থান পায় নি। সমাজ ও সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রবাহ তাঁদের চেতনায় অনুপস্থিত। অথচ মানুষকে বাদ দিয়ে যে মানুষের ইতিহাস রচনা করা যায় না এই সত্য উপলব্ধি করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে সম্বল করে আধুনিক মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, উপলব্ধি করে যে লোকবৃত্ত অনুশীলন না করলে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীকে স্পর্শ করা যায় না, যায় না তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে ইতিহাস, সমাজ ও বিজ্ঞানের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা। জানা যায় না অতীতকে, জানা যায় না সমসাময়িক সমাজের পুরুষানুক্রমে লালিত-পালিত জীবনবেদকে, পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত অনুশীলনের দ্বারা, লোকবৃত্তের গবেষণার দ্বারা, সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা ও ইতিহাস অনুধাবন করা যায়।

অনুকরণ কিংবা অনুসরণ অথবা ফেলে আসা দিনের বাঁধা পথে চললে সত্যানুসন্ধানী হোঁচট খাবেনই। এগিয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাঁদেরকে স্ব স্ব ঐতিহ্যানুযায়ী চালিত করার জন্য লোকবৃত্ত কি শিক্ষা দেয় তা অনুশীলন করতে হবে বিষয় অধ্যয়নকালীকে, কোন অনীহার সাময়িক নিরাসন অথবা হুজুগ বা ফ্যাসানের আমেজে লোকবৃত্তের অনুশীলন নয় সত্যটি বুঝতে হবে। বৃহত্তর জন সমষ্টির কাছে থেকে আহৃত জ্ঞানের আলোকে নতুন নিভুল পথ তৈরীর সামর্থ অর্জনের জন্য এবং সমসাময়িক জন-জীবনকে অন্তরতর করে জানার জন্য, সুন্দরতর করে গড়ে তোলার জন্যই লোকবৃত্ত চর্চার প্রয়োজনীয়তা। মানবের জীবিকাগত ও রিপুগত দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের কারণ নিরূপণের মাধ্যমে মানব চরিত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোকপাত করে লোকবৃত্ত, সত্যে পৌঁছতেও সে সাহায্য করে। এ জন্যই এ যুগের জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ সমাজের একাংশ লোকবৃত্তকে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করছেন এবং তারা লোকবৃত্তকে লোকসমাজকে জানার জ্ঞানশিক্ষা বা জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা বলে গ্রহণ করার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

স্মরণীয় কোন অঞ্চলের লোকবৃত্ত গবেষণা বা আঞ্চলিক অধ্যয়ন আজকের বিশ্বজনীনতার যুগে বিচ্ছিন্ন তথ্যের সংগ্রহমাত্র নয়। মনে রাখতে হবে যে সংগৃহীত তথ্যের সামগ্রিক মূল্যায়ণের মধ্যেই স্থানীয় লোকবৃত্তের বিস্তার ও উপলব্ধি। তাই লোকবৃত্ত গবেষণায় শুধু অঞ্চল বিশেষথেকে সংগ্রহ

বা বিবিধ তথ্য ও ঘটনার মালখানা তৈরী করলে কর্তব্য পালন করা হয় না। রঙ্গীণ জাতীয়তা বা উগ্রআঞ্চলিকতা বোধাহত বিশ্লেষণও লোকবৃত্ত গবেষকের উপজীব্য নয়। বিচার বিশ্লেষণ, পরিমিতিবোধ, প্রয়োগ ও সুনির্দিষ্ট উপাদান ব্যবহারের কৌশল পরিজ্ঞাত হওয়া প্রত্যেকটি লোকবৃত্ত কর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব।

অর্থাৎ, লোকবৃত্ত কর্মীর পক্ষে শুধু সংগ্রহ ও অনুসন্ধানই যথেষ্ট নয়, তাকে করতে হবে বৈজ্ঞানিক সর্তানুসারে সংগৃহীত তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও মর্মোদ্ঘাটন। তাকে হতে হবে একাধারে বিচারক ও তাত্বিক, মেঠোকর্মী ও অভিজ্ঞ বিশ্লেষক। তথ্য সংগ্রহক তথা গবেষক ও বিশ্লেষকের থাকতে হবে দেশ কাল জাত, সামাজিক, ধর্মীয়, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্বিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ বিজ্ঞানীর জ্ঞান। দেশজ চিন্তা-চেতনা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সংস্কার-কুসংস্কার, নাচ-গান, খাদ্য-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। অন্য কথায় তাকে অর্জন করতে হবে সমস্ত জ্ঞানশাখায় প্রয়োজনীয় ব্যুৎপত্তি। এক-কথায় মানুষের সামগ্রিক জীবন ধারার সঙ্গে তাঁকে সামিল হতে হবে। তবেই তিনি লোকসমাজের জীবনবৃত্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। তবেই তিনি সংগ্রহকে বিচার বিশ্লেষণান্তে বৃহৎ জনসমাজের কাছে তুলে ধরতে পারবেন। এ কাজে প্রথমেই তাঁকে ঠিক করে নিতে হবে-কোনটা লোকবৃত্ত এবং কোনটা লোকবৃত্ত নয়। বলাবাহুল্য, এই লোকবৃত্ত বলতে আমরা লোকবৃত্তের উপাদানকে বোঝাতে চেয়েছি। লোকবৃত্তের উপাদান এবং লোকবৃত্ত উভয়কেই একই শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করার দরুণ পাঠক সাধারণের বিষয় অনুধাবনে অসুবিধা হতে পারে। এই অসুবিধা দূরীকরণে ইংরেজী ভাষায় ফোকলোর এর উপাদানকে Folkloristics বলা হয়েছে। আমরা folkloristics এর বদলে folklorology শব্দ গ্রহণে অধিক আগ্রহী। অবশ্য ইংরেজী ভাষাভাষীদের কাছে আমাদের আগ্রহ কতটা সমর্থন পাবে জানি না, তথাপি প্রস্তাবিত শব্দটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। Sociology, Anthropology, Archaeology প্রভৃতির সঙ্গে Folklorology শব্দটি বেশ মানিয়ে যায়। আর ফোকলোর এর বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে এই শব্দ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।

লোকবৃত্ত যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার এ স্বীকৃতি বেশী দিনের নয়। স্বীকৃতি পাবার পর থেকেই বিশ্বব্যাপী চলেছে কাঁচামাল সংগ্রহের অভিযান। সংগ্রহান্তে চলেছে শ্রেণী বিভক্তিকরণ, মর্মোদ্ঘাটন, ব্যাখ্যান প্রভৃতি প্রক্রিয়া। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অবক্ষয়ী ভাবধারার প্রসার ও প্রয়োগবাদী মনোভাবের বিস্তার। একই সঙ্গে চলেছে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ঠিক ঠিক কাজ করতে না দিয়ে বিপথে চালিত করার প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের জন্য সৎ গবেষক ও কর্মীরা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছেন লোকবৃত্তের চালিকা-শক্তি, এবং চালিকা-শক্তি খুঁজে বের করতে এসে বা পূর্ণায়ত মানুষের জীবনবৃত্তের সামিল হতে গিয়ে তাঁরা শব্দটির নানাবিধ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। এই সব সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা পণ্ডিত ও গবেষক মহলে সুপরিচিত। সাধারণ পাঠক তা নিয়ে মাথা ঘামান না, এবং অনেক সময় শাব্দিক কচকচানি তাঁদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এহ বাহ্য।

নগর সভ্যতা পত্তনের শুরু থেকেই নগর সংস্কৃতির পাশাপাশি আদিম-গ্রাম্য-পল্লী-লোক সংস্কৃতি সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে। সমান্তরালভাবে চললেও একটি সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতি থেকে পৃথক।

একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ এবং অপরটি কিছু ঐতিহ্য কিছু ধার করা সংস্কৃতিতে বলীয়ান। গ্রামীণ বা পশ্চাৎপদ বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে লোকসংস্কৃতির সজীব অবস্থান ও সতেজ অভিব্যক্তি। প্রথমতঃ স্মরণীয় পশ্চাৎপদ অংশীদার হিসাবে আদিম তথা উপ-খণ্ড-বিযুক্ত-বন্য-জাতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা লোকসমাজভূক্ত হয়ে পড়ে বহু গবেষকের চোখে। পরে অবশ্য তাঁরা লোকসমাজের বাইরে আদিম সমাজ ও সংস্কৃতির আওতায় আসে, তখন আদিম সমাজ ও সংস্কৃতিপুষ্ট মানুষের কোন কোন কৃত্য লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হলেও সামগ্রিক ভাবে আদিম সংস্কৃতি একটি ভিন্ন চেহারা নিয়ে দাঁড়াল, সুতরাং যা কিছু আদিম বা বন্য তা সবই লোকসংস্কৃতির অঙ্গ নয়। কিন্তু লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় প্রায়শই এমনভাবে উভয় সংস্কৃতিকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয় যা দেখে নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ভ্রু কুচকাচ্ছেন। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির পণ্ডিত গবেষকগণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টির অনুধাবন ও পর্যালোচনা করলে নৃতাত্বিক পণ্ডিতগণের নিকট থেকে তাঁদের এই অবজ্ঞা সইতে হত না।

নগর-সংস্কৃতি-আদিম ও লোকসংস্কৃতির নির্যাসসিক্ত হলেও যতদূর সম্ভব তাদের ছোঁয়া পরিহার করে চলতে সচেষ্ট। যদিও সুদূর অতীত থেকে এরা নগর সভ্যতা, চিরায়ত শিল্প সাহিত্য অসন-বসন ও সৌন্দর্য-বিলাসের বৈভব প্রদান করে চলেছে, এত দিয়ে এবং এত অবজ্ঞা সয়েও ওরা অফুরন্ত। অপূর্ব প্রাণসুষমায়মণ্ডিত। পূর্বে সংস্কৃতির মধ্যে এত বিভাজন ছিল না। ক্রমাগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন আদিম ও লোকসংস্কৃতি নিজস্ব চেহারা নিয়ে দাঁড়াল, তেমনি অপর দিকে নগর তথা শাসক সংস্কৃতি আরেকটি চেহারা নিয়ে উপস্থিত হল। সংস্কৃতির বিভাজন তখন থেকে সুরু হল যখন পুঁজির দাপট সারাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত, যখন বিনিময়ের বদলে টাকা আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পেল। আর্থিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালটাতে সুরু করল মানুষের জীবনবোধ। এই বোধ থেকে এসেছে প্রাচীন, আদিম, পল্লী, গ্রাম্য ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য। এসেছে লোকবৃত্তের পরিধি, ব্যাপ্তি ও অবয়ব নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা ও জিজ্ঞাসা। ক্রমে প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পকলাদির গবেষণার সঙ্গে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজ-ভাষাতত্ত্ব, মনোবিদ্যা এবং আদিম জনজীবনের বৃত্তান্তের সঙ্গে লোকবৃত্ত গবেষণারও তফাৎ সূচিত হয়, তফাতের সূক্ষ্মতা গবেষকের চোখে ধরা না পড়লে সব জিনিসকে একাকার করে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব, অবশ্য, কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আহরণের জন্য শুধুমাত্র সেই বিষয়টি অধ্যয়নের মধ্যেই তা সম্ভব নয়, অর্থাৎ বিষয়টিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য কাছাকাছি সব বিষয় সম্পর্কেই গবেষককে জানতে হবে। এছাড়া সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া যায় না, তাই বিভাগীয় জ্ঞানসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কোন প্রচার কর্মী, 'পক্ককেশ' নিয়ে গবেষণা সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রচার যন্ত্রের মহিমায় 'আজীবন গবেষক' ও 'শিক্ষক' বলে প্রচারিত হতে পারেন, কিন্তু বিষয় জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু কিছুতেই বিশেষজ্ঞ হয়ে টিকতে পারেন না। তবুও তাঁদের কর্মে বাধা দেওয়া যায় না। কারণ লোকবৃত্তের মজুত ভাণ্ডারে হানা দেওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব, কারণ লোকবৃত্তের প্রবেশদ্বারে কোন দ্বাররক্ষী নেই, অথচ কে না জানে যে লোকবৃত্ত লোক-সমাজকে জানার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সে হাতিয়ারের ব্যবহার তিনিই করতে পারেন যিনি বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

লোকবৃত্ত বংশ পরম্পরায় সঞ্চিত লোকসমাজের জ্ঞানভাণ্ডার। এই জ্ঞানভাণ্ডারের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় লোকসমাজের শ্রমপ্রক্রিয়া অনুধাবনে। শ্রীঅরুণকুমার রায় 'লেখা ও রেখা' সাময়িক পত্রের শ্রাবণ আশ্বিন সংখ্যায় এতৎ সম্পর্কে একটি আলোচনা রেখেছেন তাঁর 'লোকায়ন চর্চার ভূমিকা' নিবন্ধে। তিনি একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার তাঁর আলোচনা সেই দার্শনিক মতবাদভিত্তিক হয়েছে, যার সঙ্গে হয়ত সকলে একমত হবেন না। একই দার্শনিক মতে আস্থাশীল সুনীল চক্রবর্তী তাঁর 'লোকায়ত বাংলা' (১৯৮৯) গ্রন্থে শ্রম-প্রক্রিয়ার জয়গান গেয়েছেন। উভয়েই নিজ নিজ চিন্তা-চেতনা ও ভাবনাভিত্তিক, সংজ্ঞা উত্থাপন করেছেন এবং ফোকলোর শব্দটির বঙ্গানুবাদ করেছেন, কয়েক বৎসর পূর্বে কোন একটি আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান লেখক বলেছিলেন, যে বিদেশে ফোকলোর তথা লোকবৃত্তের সংজ্ঞা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চললেও এদেশে লোকবৃত্তের এমন কোন সংজ্ঞা আমাদের লোকবৃত্তের পণ্ডিতগণ এযাবৎ উপস্থাপিত করতে পারেন নি যা বিশ্বের লোকবৃত্তের গবেষক ও পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এই কথার জের টেনে শ্রীরায় লিখেছেন—'শঙ্কর সেনগুপ্তের উক্তি যদি সঠিক হয় তা হলে বর্তমান প্রবন্ধকারই (শ্রীরায়) সর্বপ্রথম ভারতে লোকায়নের (ফোকলোরের) সংজ্ঞা উপস্থাপনা করছেন।' শ্রীরায়ের এ দাবী সম্পর্কে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ তার উত্তর দেবে। তবে তাঁর মতে 'যে সজীব উপাদান সমূহ মানব সভ্যতার ঊষাকালে যৌথ প্রয়াসে সর্বজনগ্রাহ্য উপসৌধগুলির ভিত্তিভূমি রচনায় সহায়তা করেছিল এবং শ্রেণীভিত্তিক সমাজ অতিক্রম করে এর নব অভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যতের এক উচ্চতর সর্বজন গ্রাহ্য সাংস্কৃতিক উপসৌধ গড়ার চালিকা-শক্তিরূপে আমাদের যুগের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে···রূপে দেখা দেয় তাকেই লোকায়ন (folklore) বলে।" শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন 'মানবসভ্যতা তথা ইতিহাসের আদিম-স্তর থেকে সুরু করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উত্থান-পতন বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ভাবীকালের শ্রেণীহীন সমাজে তার (লোক সংস্কৃতি) অপরাজেয় অভিযান···আরণ্যক, গ্রামীণ, নাগরিক সংস্থান নির্বিশেষে সর্বস্তরে লোকসংস্কৃতির দৃপ্ত পদসঞ্চার। সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সর্বপ্রকার অর্থনীতি, সামাজিক বিবর্তন পরিবর্তনের ধারায় বিবর্তনশীল লোকসংস্কৃতির ভিত্তি। অর্থনীতি নিশ্চয়ই মূলক অর্থনীতিই বনিয়াদ। লোকসংস্কৃতি চিরবহমান, অমর।···শ্রমপ্রক্রিয়া তথা মেহনতের উৎস থেকেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব।' উপরের বক্তব্যদ্বয় লোকবৃত্ত বিজ্ঞানের কাছে কতটা গ্রহণীয় লোকবৃত্তের কর্মী ও গবেষকগণ তা ঠিক করবেন, কিন্তু লোকবৃত্তের অন্যতম উৎসমুখ যে শ্রমপ্রক্রিয়া তা অস্বীকার করা যায় না। মানুষ ও সমাজ অবিচ্ছেদ্য। মানুষ সমাজ ছাড়া বসবাস করতে পারে না। শ্রমের প্রকৃতি সমষ্টিগত বা যৌথ। এই যৌথ প্রকৃতির গুণেই আদিম মানুষের সমাজে উৎপাদনী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এবং সমাজের ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ পরস্পরের সহযোগিতা সৃষ্টি হয়। এই সহযোগিতার মধ্যে সৃষ্টি হয় ফোকলোর তথা লোকবৃত্ত, এবং এই সহযোগিতা থেকেই আসে ঐতিহ্য-বোধ, বিশ্বাস ও ধর্মচেতনা, আসে কর্মপ্রেরণা ও সুখী জীবন পরিচালনার চালিকাশক্তি। সৃষ্টি হয় গান আমোদ আহ্লাদ ও সময় কাটাবার জন্য লোকক্রিয়া আরও কত কি। তাই লোকবৃত্ত ও লোকজ্ঞান ব্যষ্টি নয় সমষ্টির জীবনাভ্যাসের জ্ঞান, জীবনাচরণের জ্ঞান—মহাজ্ঞান।

শব্দসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের গভীরতার দিকে নজর দেওয়া হয়। ফোকলোর অভিধানে

তাই ২১ জন মার্কিন পণ্ডিত গভীর মননশীলতার সঙ্গে ফোকলোর এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে যে ২১ রকম সংজ্ঞা উপস্থাপিত করেছেন তাতেই তার ব্যাপকত্ব ধরা পড়েছে, তারপর আরও নানাভাবে হামেশাই এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাদের কর্মকাণ্ড আমাদের গবেষক ও পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত তাই তার পুনরাবৃত্তির কোন মানেই হয় না। ইতিমধ্যেই আমরা 'ফোকলোর' এর প্রতিশব্দ হিসাবে লোকবৃত্ত ব্যবহার করেছি। অন্যান্য গবেষক পণ্ডিতেরা যে সব কাজ উপহার দিয়েছেন তারও উল্লেখ করেছি আলোচনার সুরুতে। প্রায় সকলেই নিজ নিজ অনুবাদের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন, পরস্পরাগতভাবে সকলের যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্যে ফোকলোর তথা লোকবৃত্তের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভব। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমরা নানা কারণে এত বিশদ হতে পারব না, এখানে শুধু এতটুকুই বলার চেষ্টা করা হবে যে এতগুলো শব্দ থেকে কোন একটাকে গ্রহণ না করে কেন আমরা 'লেকবৃত্ত' শব্দটিকে 'ফোকলোর' এর সার্থক অনুবাদ বলে মনে করি।

ডবলু জে, থমস সৃষ্ট ইংরেজী ফোকলোর ফোক এবং লোর এ দুয়ের সমন্বয়ে জন্ম হয় ১৮৪৬ সনে। সৃষ্টিলগ্নে শব্দদুটির পৃথক সত্তা বোঝাবার জন্য শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটি হাইফেন (-) ব্যবহৃত হত পরবর্তীকালে মার্কিন প্রভাবে হাইফেন বিদায় নিয়ে একটি শব্দে রূপান্তরিত হয়। যখন শব্দদুটি এক হয়ে যায় তখন অনেকে একে অনুবাদ করেন লোকসংস্কৃতি হিসাবে। কিন্তু ১৮৬৬ সন থেকে যখন কালচার শব্দটি আমদানী করেন ই, বি, টাইলর তখন থেকে 'কালচার' শব্দের অনুবাদ হয়ে এসেছে সংস্কৃতি। মাঝখানে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির কৃপায় কিছুদিন 'কালচার' শব্দের বঙ্গানুবাদ সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু জন প্রয়োগে ও রবীন্দ্রনাথের সমর্থন না পাওয়ায় তা তেমন সমাদৃত হয় নি।

গণতন্ত্রের আদর্শে সমাজ ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের প্রতি গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী পালটিয়ে যখন তা মানবমুখী হল তখন ঐতিহাসিকগণ সমাজের দিকে দৃষ্টি দিতে থাকেন এবং সমাজের সামগ্রিক সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। এরই ফলে সাধারণ মানুষ তাঁদের অধ্যয়নের বিষয়ে পরিণত হয়। মানে লোকসমাজের শ্রম, কর্ম ইত্যাদি জানার দিকে তাঁদের ঝোঁক দেখা যায়, দেশে দেশে লোকবৃত্ত সংগ্রহ ও অধ্যয়নের সাড়া পড়ে যায়। লোকবৃত্তকে তখন নৃতত্ত্ব ও ভাষা তত্ত্ব অধ্যয়নের একটি অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা হয়, ফলে প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রতি ঝোঁক এসে পড়ে।

ফোকলোর শব্দটি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সে বর্তমান চরিত্র পায় নি। 'ফোকলোর' এর 'ফোক' প্রথমে জাতি অর্থে ব্যবহৃত হত ক্রমে অর্থ সঙ্কোচ হয়ে এখন জনসাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। প্রিমিটিভ বা আদিম জাতি অর্থেও 'ফোক' শব্দের ব্যবহার হত। পরে বলা হল যে প্রাচীন চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যের উপর যে সমাজ এখনো দাঁড়িয়ে আছে তাদের ঠিক 'প্রিমিটিভ' বা আদিম বলা যায় না। তখন থেকে হয়ে আসছে জনসাধারণ অর্থে এর ব্যবহার। ইংরেজী শব্দটিকে নিয়েও অনেক আলাপ আলোচনা চলে। অনেকে অনেক ভাবে এর ব্যাখ্যা করেন এবং উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেন। অনেকে দাবী করেন যে অ্যাংলো-স্যক্সন Folkore শব্দটি জার্মান volkskunda শব্দের অনুবাদ, এই জার্মান শব্দটি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে জার্মান ভাষায় প্রচলিত।

ভারতীয় ভাষায় volk বা volks এর অনুবাদ করা হয়েছে 'লোক'। এই লোক শব্দটি সুপ্রাচীন ভারতীয় শব্দ। বৈদিক যুগ থেকে বিভিন্ন অর্থে হয়ে চলেছে এর প্রয়োগ প্রায় সমার্থক ও প্রাচীন শব্দ গণ। 'ফোর' এর অনুবাদ অনেকে করেছেন 'জন'। 'জন' প্রাচীন শব্দ। সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থে 'জন' মানব সমাজকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিক থেকে 'জন' ও লোক শব্দের সখ্যতা বিদ্যমান, কিন্তু ব্যবহার ও ঐতিহ্যের প্রচারে লোক শব্দটি বেশী জনপ্রিয়। টিউটনিক ভাষা থেকে আহৃত প্রাচীন ইংরেজী Lore-কে জ্ঞানদান বা জ্ঞান আহরণ করার অর্থে জার্মানরা বলতেন Lehre এবং ডাচরা Leer, আরও পরে এর অর্থ হয় লোক জ্ঞান বা wisdom of the folk.

'লোক' সুপ্রাচীন ভারতীয় শব্দ তথাপি এর উৎপত্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন তথ্য আমাদের জানা নেই। ঋগ্বেদের 'দেহি-লোকম' স্থান অর্থে ব্যবহৃত। শুক্ল এবং অথর্ববেদে 'লোক' দুভাবে অবস্থান করছে। কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থ, বৃহদারণ্যক ও বাজসেনীয় সংহিতায় এর কোন ভেদাত্মক স্থিতির উল্লেখ নেই। আর্য আগমন এবং আর্য-অন-আর্য সংঘর্ষের ফলস্বরূপ 'লোক' শব্দের অর্থ পাল্টে যায়। এবং বেদোত্তর সংস্কৃতির সীমিত অর্থ থেকে 'লোক' এর অর্থ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। গীতায় লোকশাস্ত্র এবং অলৌকিক আচারের গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশ্য এই 'লোকশাস্ত্র' লোকসমাজের শাস্ত্র নয়, অন্য মানে বহন করে। অশোক শিলালেখ-এ লোক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, প্রজা অর্থে ও প্রজার হিতার্থে। বৌদ্ধ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লোক মানব অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ সাহিত্য লোকজত্রা (লোকযাত্রা) লোকপুরায় (লোকপ্রবাদ) আদি শব্দ লৌকিক নিয়ম অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে লোক (সমাজ) ব্যাপক অর্থে কল্পিত। যে পুরুষরূপী ঈশ্বর, যার হাজার হাজার মুখ, ততোধিক চক্ষু আর পদ সেই লোক বহুরূপে ব্যাপ্ত। অর্থাৎ লোক শব্দটি বর্গভেদ রহিত, এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্বে পূর্ব অর্বাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্যোতক। নগর ও গ্রাম তথা পল্লীসংস্কৃতির উভয় রাজ্যেই শব্দটির সমানাধিকার। সুতরাং 'ফোকলোর' এর 'ফোক' এর অনুবাদ নিয়ে তেমন কোন মতান্তর উপস্থিত হয় নি। হয়েছে 'lore' এর অনুবাদ নিয়ে। 'লোর' শব্দটিকে এক একজন এক এক দৃষ্টিতে অনুবাদ করতে গিয়ে 'ফোকলোর' এর বিভিন্ন অনুবাদ উপস্থাপিত করেছেন। 'লোর' শব্দের সার্থক অনুবাদ এখনও হয় নি। ইংরেজী 'লোর' বলতে জ্ঞান বা Knowledge gained through study of experience অথবা traditional knowledge or belief কে বোঝায়। লোক মানুষের জীবন সংগ্রাম, প্রকৃতির উপর তার অধিকার বিস্তার প্রয়াস, এবং জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে সৃষ্ট উপাদান সমূহ লোক সমাজের চালিকা শক্তি। এই চালিকাশক্তি জ্ঞানতত্ত্বের তালিকাভুক্ত। লোকসমাজের সবকিছু এর অন্তর্গত। যদিও ঢাকা বাঙালা একাডেমির বর্তমান ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ মথহারুল ইসলাম বলেছেন—"লোকবৃত্ত বলতে যা কিছু লোকজীবনের অন্তর্গত তার সব কিছুকেই বোঝায়। ফোকলোর লোকজীবনের একটি বিশেষ দিক আমাদের সামনে তুলে ধরে—তার সাহিত্য, তার বিশ্বাস, তার আচার অনুষ্ঠান, তার দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত কিছু কিছু জিনিষপত্র, তার শিল্প, তার যানবাহন ইত্যাদি। কিন্তু একজন ফোক বা লোক রাতে কি ভাবে ঘুমায়, কিংবা তার পুত্রের সঙ্গে কি ভাবে আচরণ করে, কিংবা তার প্রতিবেশীর সঙ্গে কি ভাষায় কথা

বলতে অথবা তার আত্মীয় এলে কি খেতে দেয় এসব নিশ্চয়ই ফোকলোরের অন্তর্গত হতে পারে না। এগুলো বৃহত্তর অর্থে Folk Civilization এবং আরও সীমিত অর্থে Folk Culture এর অন্তর্গত, সুতরাং লোকবৃত্ত দ্বারা ফোকলোর এর সার্থক দ্যোতনা ও অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়।" (পূর্ব বাঙলায় লোক সংস্কৃতি) ডঃ ইসলাম আরও বলেছেন 'ফোকলোর এর সীমা এমন সর্বপরিব্যাপ্ত নয়···লোকবৃত্ত শব্দে লোকদের সামগ্রিক পরিচয়ের কথা বলা যেতে পারে—অন্তপক্ষে ফোকলোর সামগ্রিক পরিচয় দান করে না।' বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের এই উক্তির সঙ্গে সহমত হওয়া যায় না। লোকবৃত্তের মধ্যে যদি লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় তবে ফোকলোর এর অনুবাদ হিসাবে লোকবৃত্তকে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা দেখি না। আমরা ফোকলোর তথা লোকবৃত্তের মারফৎ লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচয় পেতেই চাই। খণ্ডিত অংশকে আমরা লোকবৃত্তের অংশ বলে মনে করি। মনে করি লোকবৃত্ত তথা ফোকলোর থেকেই folk civilization বা লোকসভ্যতা এবং folk culture বা লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি। ডঃ ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্যের কারণ মৌল। তিনি গোটা জিনিষকে খণ্ডচিত্রের মারফৎ দেখতে চাইছেন আর আমরা গোটা জিনিষটাকে গোটারূপেই দেখতে চাই, চাই বলে তার যুক্তি মানতে না পারার জন্য দুঃখিত। অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁর লোকায়ত বাংলা গ্রন্থে বলেছেন যে Folklore এর অনুবাদ হিসাবে 'অভিব্যাপ্ত' ও 'অব্যাপ্ত' এবং ব্যাসবাক্যের অন্যতম মুখ্যশব্দ 'জ্ঞান' সমাস নিষ্পন্ন সমস্তপদ লোকবৃত্ত থেকে তিরস্কৃত···ফলে···লোকবৃত্ত শব্দটি প্রত্যাশিত অর্থবহনে অক্ষম ও অনর্থবাচক হয়ে পড়েছে।···বিনীতভাবে নিবেদন করতে হচ্ছে যে শ্রীচক্রবর্তী শব্দটির তথা বিষয়টির গভীরতা ও ব্যাপকত্ব অনুধাবনে সক্ষম হলে 'অভিব্যাপ্ত' এবং 'অব্যাপ্ত' একই সঙ্গে ব্যবহার করতেন না। তাছাড়া ব্যাসবাক্যের অন্যতম মুখ্যশব্দ 'জ্ঞান' সমাস নিষ্পন্ন সমস্তপদ লোকবৃত্ত থেকে তিরস্কৃত—লোকবৃত্তের আলোচনায় এ যুক্তি মোটেই প্রাসঙ্গিক নয়, কাজেই তাঁর খণ্ডন গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারছি না। ডঃ দুলাল চৌধুরী তাঁর 'বাংলার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন 'বৃত্ত শব্দের দ্বারা একটি সীমার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ···হয়। লোকায়ত সংস্কৃতি যে প্রাণধারনপ্রবাহে কালকালান্তরে প্রবাহিত হচ্ছে, গণ্ডী এঁকে তাকে পাওয়া যাবে না।' লোকবৃত্তের বৃত্ত একটি কেন্দ্র বিন্দু। এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে লোকজ্ঞান বিচ্ছুরিত দিকে দিকে সীমাহীন পথে। কাজেই গণ্ডী আঁকার প্রশ্ন এখানে আসতেই পারে না। আর সেজন্য তাঁর সঙ্গেও একমত হতে পারা যায় না। যতদিন না অন্যকোন উপযুক্ত গবেষক 'লোকবৃত্ত' শব্দটি গ্রহণের বিপক্ষে আরও গ্রাহ্য তথ্যাদি উপস্থিত করেন অথবা সর্বজন স্বীকৃত কোন শব্দ উপহার দেন ততদিন 'ফোকলোর' এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে লোকবৃত্ত গ্রহণে কোন বাধা দেখি না। তাছাড়া, ইতিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, মনোবৃত্ত প্রভৃতি শব্দের সঙ্গেও লোকবৃত্তের একটি চমৎকার মিল লক্ষিত হয়। লোকসমাজকে বৃত্ত বা কেন্দ্রবিন্দু ধরে লোকসমাজ সম্পর্কিত সর্বপ্রকার জ্ঞানকে আমরা লোকবৃত্ত বলতে পারি। লোকবৃত্তের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এটি প্রবহমান, ঐতিহ্যধারা প্রবাহের মুখে পড়ে নষ্ট হয় না বরঞ্চ নিত্য নবরূপে প্রকাশিত হয়। তাই এর মধ্যে গতানুগতিকতা থাকে, থাকে লোকসমাজের অপরিমিত শক্তি সাহস, মনোভাব, সিদ্ধান্ত, বিশ্বাস, রাগ, দ্বেষ, ঐতিহ্য বন্ধন তুকতাক অনুমান রীতিনীতি রেওয়াজ, গীতগান, বেশভূষা প্রভৃতি লোক চৈতন্যপূর্ণ

অস্তিত্বের ঘোষণা, শুধু প্রাচীনকে নিয়েই নয়—জীবিত লোকভাব, লোকবিভক্তি ও লোকবৃত্তের অধ্যয়নের বিষয় কারণ এটি নির্জীব বিজ্ঞান নয়। বাহ্যিক দিকের অপেক্ষা এর আন্তরিক দিকের অধ্যয়ন বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

মনে রাখতে হবে মানুষের মধ্যে উদ্ভূত কোনও শব্দ পরিপূর্ণ বা নির্দোষ নয়। অন্যান্য বস্তুর মত কোন ভাষাও ভাবপ্রকাশে এবং উচ্চারণ, লিখন ও বর্ণবিন্যাস বিষয়ে পূর্ণভাবে নিয়মানুবর্তিতায় ত্রুটীহীন নয়। দোষ, গুণ মিলিয়ে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় প্রকৃতি বা ধর্ম গড়ে ওঠে। যুগধর্ম অনুসারে ও ব্যবহারী মানুষদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক গতি অবলম্বনে ভাষা ও শব্দের প্রকৃতিতে ও ধর্মে পরিবর্তন আসে। কারণ সে বহতা নদী, বদ্ধ উদক নয়। স্বাভাবিক গতিতে সে চলে। এ গতি বিবর্তনমূলক, বিপ্লবাত্মক নয়, সুতরাং আবশ্যক মত 'লোকবৃত্ত' ও পাল্টাবে বা বদলে যাবে; কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন এ শব্দটিকে ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করি না।

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

সহজ রচনাশিক্ষা।

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এই পাঠ্যপুস্তকটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল জানা যায় নি। 'দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৭৪ (ডিসেম্বর), ১৮৭৬ ও ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের 'Advertisement' অংশের প্রথমে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে—'It is a standing reproach against the educated Bengali that he cannot write in his mother tongue. The reproach has perhaps an application still more forcible in the case of those who receive only an elementary education in the Vernacular Schools than in the case of their more educated brethren turned out of the Colleges. But the Bengali student labours under a serious disadvantage in this respect ; there exist no rules for his guidance, more at least which an ordinary teacher is able to prescribe for his study. The compiler of this little primer on composition has endeavoured to collect in it some rules derived from the practice of the best writers in the language and from his own experience in Bengali composition. He has tried to render it suited to the capacity of beginners and to be as brief as well as clear as possible.'

গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় 'রচনা অভ্যাস'। মোট আটটি পাঠে উদ্দেশ্য, বিধেয়, ক্রিয়া, বিশেষণ প্রভৃতি আলোচনা দ্বারা প্রাথমিক বাক্যরচনা শেখান হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারটি পাঠ যথাক্রমে—বিশুদ্ধি অর্থব্যক্তি, প্রাঞ্জলতা ও অলঙ্কার সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পত্রলেখার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির শেখানর ভঙ্গী একান্ত সহজ ও মনোরম।

সংযুক্তা (গদ্য পদ্য ও কবিঃ পুঃ)।

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', চৈত্র ১২৮৪, পৃ, ৫২৯-৫৩৩।

বাল্যকাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা ইতিহাসাশ্রয়ী ছিল। বিশেষভাবে টডের রাজস্থান গ্রন্থ তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল। পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার কাহিনী নানাভাবে নানারূপে বিবৃত হয়েছে। এখানে মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণে পৃথ্বীরাজের মৃত্যু ও সংযুক্তার চিতারোহণ দীর্ঘ কবিতায় সাবলীল ছন্দে বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেমের প্রকাশ কবিতাটির মধ্যে রয়েছে। কবি শেষে লিখেছেন—

'কবি বলে মাতা কি কাজ করিলে
সন্তানে ফেলিয়া নিজে পলাইলে,
এ চিতা অনল কেন বা জ্বালিলে,
ভারতের চিতা পাঠান ভরে।
সেই চিতানাম, দেখিল সকলে
আর না নিবিল ভারতমণ্ডলে
দহিল ভারত তেমনি অনলে
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে ॥

স্বজনপ্রীতি (ধর্ম:/২৩) ॥

প্রীতিই যে ঈশ্বরসেবার প্রকৃত উপায়, একথা বঙ্কিমচন্দ্র অনেকবার ব্যক্ত করেছেন। এখানেও গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে স্বজনপ্রীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বজনপ্রীতির প্রধানতঃ দু'টি ধারা। একটি হল অপত্যপ্রীতি, অর্থাৎ পুত্র-কন্যাদের প্রতি ভালবাসা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। অন্যটি হল দাম্পত্যপ্রীতি, স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কে। এছাড়া সংসারের অন্যান্য পরিজনের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করাও কর্তব্য।

স্বদেশপ্রীতি (ধর্ম/২৪) ॥

আত্মপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি অপেক্ষা স্বদেশপ্রীতি যে অধিকতর কাম্য এখানে সেকথা বোঝান হয়েছে। কারণ দেশ শত্রুর দ্বারা পীড়িত হলে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা তথা ধর্মরক্ষা সম্ভব হবে না। এই স্বদেশপ্রীতি যে ইংরাজী প্যাট্রিয়টিজম-এর নকল নয় একথা বঙ্কিম বলেছেন। 'ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লিখেন।'

সাবিত্রী (গদ্য পদ্য বা কবি: পু:)

প্র: প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃ, ৩৭১-৩৭৩।

'সাবিত্রী' কবিতায় সাবিত্রী সত্যবানের পৌরাণিক কাহিনীর অংশবিশেষকে রূপদান করা হয়েছে। নির্জন বনে সাবিত্রী মৃতস্বামীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় যম এলেন সত্যবানের মৃতদেহ নিয়ে যেতে। কিন্তু সাবিত্রী দেহ ছাড়তে চাইলেন না। তখন যম সাবিত্রীকে সৃষ্টির নিয়ম বোঝাতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত সাবিত্রী বললেন—স্বামীকে যদি নিতে হয় তবে যেন এই সতীনারীর প্রাণও নেওয়া হয়। এইভাবে সাবিত্রী পতির জন্য প্রাণত্যাগ করলেন।

কবিতা, আরাম, বিরাম, সংগ্রাম

কবি বললেই একটা ছবি ফুটে ওঠে। একটা কেন অনেকগুলো। তবে একই ভাবে। শান্ত উদাস আর আপনভোলা। অবশ্য ভাবের রকমফেরে তাঁর দাড়ি শাদা হতে পারে, অথবা খোঁচা খোঁচা, নয়ত খাটো। বেশভূষা হতে পারে উত্তরীয় অথবা পাঞ্জাবী অথবা বর্ণাঢ্য উৎকট। তিনি পদাতিক ট্রাম-বাস-রিকশো-ট্যাক্সিচারী হতে পারেন আবার বিমানবিহারীও হতে পারেন। কিন্তু আমাদের চোখে আমাদের অভ্যাসে কবি মানেই ভাবুক আর উদাসীন। এই জন্যেই কবিকে ব্যবসা করতে দেখলে চাকরি করতে দেখলে রাজনীতির মাঠে দেখলে অথবা সমরবাহিনীর শিবিরে যেতে দেখলে বলি কবিত্ব এবার গেল গেল। নিটোল নির্ভাজ কবিমানুষটির এবার পঞ্চত্বের পালা।

কিন্তু ইংলণ্ড জর্মান ফরাসী রুশ স্পেন ইতালী চীন ও বিশ্বসংসারের আরো সাত সতের দেশে এমন ঢের ঢের কবি ছিলেন বা আছেন যাঁরা রাইফেল ঘাড়ে করেছেন, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবে পুলিশের সহকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েছেন, ফেরার হয়েছেন, কেউবা লাম্পট্য করেছেন, ঈশ্বর গীর্জা ও ঐতিহ্যের মুখে কালি লেপেছেন, ফেরার হয়েছেন (খুন করেছেন কিনা জানি না) অথচ যাঁরা কবি ও বেশ বড় কবি। ইতিহাসে যাঁরা স্মরণীয়। আমাদের নজরুল নিয়মভাঙ্গা অসামাজিক ; মুক্ত স্বাধীন প্রমিথিউস। সুকান্ত বাংলাকাব্যের তীব্র নিখাদ। এককালে দলমতবাদের সংকীর্ণতায় নিন্দিত। এই ব্যতিক্রমের, কবিমূর্তির এই বৈসাদৃশ্যের সূত্রপাত মাইকেল মধুসূদনেই দেখি প্রথম। শুধু তাঁর সাহেববিয়ানায় নয় চলন-বলনে তিনি যেন পুরুষালী গন্ধের ভারী বুট পরে হাঁটছেন অথবা পুরুষকণ্ঠের খেদে বলেছেন—'রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি !'

রবীন্দ্রনাথ আপাদমস্তক কবি। সুন্দরের কবি, আরামের কবি। স্পর্শকাতর তাঁর শব্দগুলি যেন কোন রূপকথার বাগানের ফুল। রাজশেখর কবি-সংসদে বোধহয় এই কবিয়ানাকেই খানিক কশাঘাত করেছেন।

কবিতা যে নির্জন, তার ভাবগংগায় যে শান্ত উদয় অস্তের বর্ণালীর আনাগোনা এটা অস্বীকার করা শক্ত। তার ছন্দ, তার রূপকল্প তার শব্দগুলি যেন অতি সূক্ষ্মভাবে আমাদের জৈব মানবিক দৈনন্দিন জীবন থেকে একটু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সরে সরে থাকতে চায়। তাকে যতই বাস্তব দায়িত্বে নিয়োগ করা হোক না কেন সে কেনা গোলাপের মত ছোয়াল কাঁধে করতে নারাজ। ভিড়ের ভেতর তার জন্ম হলেও, ভিড় থেকে সে আলাদা। প্রয়োজনের সীমানায় তার কর্ম হলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে।

এও অস্বীকার করা যায় না যে কবিতার সৃষ্টি মুহূর্তে একটা বিরতির প্রয়োজন। সে বিরতি কেবল কালের নয়, মানসিকতার ও কবি-স্বভাবের। আরাম কেবল বাইরের নয় ভিতরেরও। বরং

ভিতরটাই আগে। কবির জীবন বেশি নিশ্চিন্ত হলে, তাঁর পরিবেশ বেশি প্রশস্ত হলে তাঁকে নয় লোকে ঈর্ষা করে আর নয় বাবু বলে। তাঁর পোষাকে বেশি সুখের চিহ্ন থাকলে হয় লোকে ভাব গদ্‌গদ হয়ে প্রণাম করে আর নয় বড়লোক বলে দূরত্ব রক্ষা করে। তবু বাউল কবি, চারণ কবি, যাঁরা চাষবাসের কর্ম করলেও যন্ত্র নয়। কবি শব্দটাকে আর একটু লম্বা করে যদি চিত্রকর আর গীতকরদের কথায় আসি তা হলেও দেখি তাঁদের ঘাম-ঝরানো সাধনা ঠিক কল-শ্রমিকদের মত নয়। শিল্পকর্মের পেশী-সঞ্চালন ঠিক উৎপাদনকারী শ্রমিকের, মেহনতী মানুষের কর্মশক্তির মত এক জাতের নয়। এতো সকলেরই জানা কথা। আর তাই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে যখন আরাম বিরাম পুঁজিবাদী ভোগের পরিসর অনেক সীমিত হয়ে আসবে তখন কবির দশা কি হবে, আদৌ কাব্য থাকবে কিনা এ নিয়ে অনেকে চিন্তান্বিত।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে কাব্য আছে, কবি আছে। সমাজবাদী, গণতান্ত্রিক, ফ্যাসীভাবাপন্ন শোষণশীল সব দেশেই আছে। যেখানে কবি শুধু লেখেন, ফসল ফলান না, যেখানে কবি কারখানায় যান না, খামারে কাজ করেন না, সেখানকার কবিতা এক ধাঁচের আবার যেখানে কবি শ্রমিক কৃষক মেহনতী জনতারই একটি সক্রিয় অংশ সেখানকার কবিতার ধরণ আর একরকম। কিন্তু দুয়েরই মধ্যে কাব্য আছে, এটা আজ দুটি বিরোধী ভাবাপন্ন সমাজব্যবস্থাতেই মান্য হচ্ছে। অর্থাৎ আরাম-বিরাম-সংগ্রাম-কর্ম সব অবস্থানেই উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম। শুধু তাদের জাত আলাদা। ইংরেজি কবিতা রাশিয়ানরা পড়ছেন হয়ত চীনারাও। আবার রুশ চৈনিক কবিতা অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে পড়া হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় কোথায় যেন সেই কবিয়ালি ঢংটা ঠিক বজায় আছে।

আমি মনে করি কবিতার কোনো শাশ্বত শাস্ত্র নেই, যেটা সর্বকালে দেশে অবস্থায় ব্রহ্মের মত এক অদ্বিতীয় আর অনড়। কবিতার প্রকারভেদ আছে। তার নিয়মের প্রকারভেদ আছে। শান্তির কবিতা আর অশান্তির কবিতা এক জাতের নয়। বিপ্লবের কবিতা আর স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থার কবিতা এক রকমের নয়। কোনো কোনো কবিতার জন্ম অতি তাৎক্ষণিক কোনো চিত্রে বা ঘটনায়, অথবা একটা তত্ত্বে। যেটাকে ইংরেজীতে 'Immediacy' বলা চলে। আবার কোনো কোনো কবিতা দূরায়ত, অথবা সর্বসাধারণ। কোনো কবিতায় একটা জনচিত্তগামী বিষয়ের অবতারণা করা হয়। একটা পাবলিক থীম নিয়ে লেখা হয়। তখন তার একটা নিদারুণ সাম্প্রতিক প্রয়োজন থাকে। হয়ত অতি দ্রুত, কবি ঘটনাচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে অথবা আতংকিত হতে হতে অথবা বিজয়োদ্ধত আশায় লড়তে লড়তে কাব্যভাষার গাঁথুনির বিন্যাসের দিকে অসতর্ক হয়ে লিখে ফেলে হাঁফ ছাড়েন আবার কোনো কবিতা সুচিন্তিত ধীর সুবিন্যস্ত অথবা সময় সাপেক্ষ এবং চিরায়তমানা বিলম্বিতা।

একই যুগে অতি নিকট কালে জীবনানন্দ ও সুকান্তের মধ্যে কী গভীর বৈষম্য। জীবনানন্দ আরাম-বিরামের কবি, সুকান্ত সংগ্রামের কবি। আরাম-বিরামটা নিন্দার্থক নয়। সংগ্রাম কথাটাও কমার্শিয়াল নয়। আমি সেদিক থেকে প্রয়োগ করছি না। জীবনানন্দ রোমান্টিক। কিন্তু রাবীন্দ্রিক নন। সুকান্ত বিদ্রোহী কিন্তু নজরুলীয় নন। সুকান্ত যেমন জনপ্রিয়, জীবনানন্দ তেমনই অন্তর্ভেদী। একজন যেমন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল, আর একজন তেমনই ছায়াঘন ও অতীন্দ্রিয়। আধুনিক

বাংলা কবিতা, মানে পঞ্চাশ ষাট দশকে মূলত মননশীল বুদ্ধিদীপ্ত অলস আরামমুখী ও নিতান্তরকম তির্যক। তার দুর্বোধ্যতা যেমন সাধনলব্ধ তার সুবোধ্যতা তেমনই সাবেকী বলে পরিহার্য। আধুনিক কবিতা অথবা সাম্প্রতিক কবিতা এই জন্য নিতান্ত আরাম-বিরাম-মুখী হয়েও যন্ত্রণাজর্জর ও ক্ষেত্র-বিশেষে বর্তমান ভঙ্গুর জীবনাদর্শে ক্ষতবিক্ষত জনসংগ্রামের আশ্বাস, উন্নততর সমাজব্যবস্থার আশা যেমন কবিকে আজ আর তেমন উৎফুল্ল করে না, তিনি যেমন গুপ্ত সুড়ংগের চিত্তসরণি দিয়ে একলা চলেছেন স্মৃতিরবোঝায় ঝুঁকে পড়ে তেমনই আতংকে কাঁপছেন, যদি বুলেটের আঘাতে তিনিও মাটিতে পড়ে যান। এই দ্বিধাদীর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে এখন কবিরা চলেছেন। তাঁদের মধ্যে বেকার আছেন, শিক্ষক আছেন, সংবাদপত্রসেবী আছেন, রাষ্ট্রপুরস্কার ধন্য, বুর্জোয়া পারিতোষিক ধন্য অলস সমাজবাদী আছেন, নিরপেক্ষ উদাসীন আছেন, আবার ভবিষ্যদ্রষ্টা স্থিতধীও আছেন।

আরাম, বিরাম, সংগ্রাম—কবিতা এই বিপরীত আলোকমালার ঐতিহ্য। যেমন দেখছি আলেকজান্দার ব্লক মায়গকভস্কি য়েট্সের কবিতায় রুশ ও য়েরোপীয় নির্যাতিত অভিশপ্ত মানবাত্মার মুক্তির গান সংগ্রামী ভাষায় অথচ প্রচারবিমুখ আশ্চর্য প্রতীকীদ্যোতনা। তেমনই আবার একালের নেরুদার কবিতায় জটিল নিষ্পেষিত মানুষের আর্তনাদ ও শৃংখলমোচনের তীব্র অভিলাষ। অপর পক্ষে শান্তির প্রত্যাশায় বিরামের সন্ধ্যায় কবিতা মানুষের তপ্ত ললাটে শীতল প্রলেপ দিচ্ছে মাখিয়ে।

যে রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন একদিন, যিনি তাঁর জীবনদেবতাকে খুঁজছেন নিভৃত মন্দিরের নিশীথের একান্তে ও আলোকিত প্রান্তরের অরুণিমায় তিনিই আবার দীর্ণবিশ্বাসে রাজনৈতিক আন্দোলনক্ষুব্ধ য়োরোপের দিকে চেয়ে তাঁর ভাষা ভংগী ও ব্যক্তিত্বের ভোল বদলে লিখলেন, 'রৌদ্রীরাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষ গান।'

যদি কোনদিন আরাম-বিরাম-ধ্বংসী বঞ্চিত জনতা সুবিধাবাদীশ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তবে সেদিন কবি তাঁর অদৃষ্টকে ধিক্‌কার দিয়ে বলতে পারেন—

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা
এবার সকল অংগ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।'

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

সমালোচনা

গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধবধি লিখ্য ভাষা রূপে বাংলাগদ্যের জন্ম; তারপরে ধীরে ধীরে ঘটেছে তার সাহিত্যিক চরিত্রের বিকাশ ও বিস্তার। গদ্যে প্রথম এসেছিল মননশীল রচনার পরিণতি; তারপরে দেখা দেয় সৃজনমূলক সাহিত্য। এদিক থেকে বাংলা প্রবন্ধ বাংলা কথাসাহিত্যের চেয়ে বয়ঃপ্রবীণ। এমন কি সামগ্রিক বিচারেও রেনেসাঁস প্রসূত বাঙালি মানসিকতার ফসল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের ভূমিকাই অগ্রজের। রামমোহন যখন বিচার-বিশ্লিষ্ট মননে দৃঢ়বদ্ধ ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন—সেই ধারায় যখন বাক্‌রীতির সাবলীলতা এবং চিন্তনেরও অনায়াসগতি আয়ত্ত হয়েছে অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে—পদ্য সাহিত্যে তখনো ঈশ্বর গুপ্তের একাধিপত্য। অতএব উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের যে সর্বাঙ্গীণ নবজাগরণ লেখা দিয়েছিল, নিছক কালের হিসেবে দেখলেও তার উৎসার গদ্য প্রবন্ধকে নিয়ে, ধারাক্রমে তারপরে জন্মেছে কাব্য নাটক এবং কথাসাহিত্য। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে প্রাসঙ্গিক মননশীলতাই সেদিন সাহিত্যের দৃঢ়বদ্ধ সর্বাত্মক অগ্রগতির ধ্রুবপদটি বেঁধে দিয়েছিল। উনিশ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ বাঙালি কবিধর্মের প্রতি বিরূপতা সূত্রেই অনুভব করেছিলেন, 'যে দেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব···' মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্পর্কেও এই অনুভব অশেষ মূল্যবহ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যে সর্বাভিমুখী মুক্তির স্বর্ণযুগ যখন ধীরে ধীরে এল, প্রবন্ধের চরিত্রও তখন হয়েছে বিচিত্র বিশিষ্ট। সেদিক থেকে বাংলা প্রবন্ধের তিনটি স্বতন্ত্র মুখ্য ধারার কথা মনে আসে—(১) জ্ঞানমূলক প্রবন্ধ, (২) সাহিত্য সমালোচনমূলক প্রবন্ধ এবং (৩) গবেষণা প্রবন্ধ। সকল যথার্থ প্রবন্ধই জ্ঞান মূলক, লিটারেচার অব নলেজ; সমৃদ্ধ অধ্যয়নের মার্জনাবশে পরিশীলিত মননের ফসল। তাহলেও চিন্তার আলম্বন ও প্রযুক্তির পার্থক্যহেতু প্রবন্ধের জ্ঞানমূলক চরিত্রের তারতম্য ঘটে। সেই অনুসারে বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি বিশুদ্ধ জ্ঞানগর্ভ বিষয় অবলম্বনে মৌলিক চিন্তার প্রসার সূত্রে লেখা প্রবন্ধকেই বিশেষভাবে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব:—রামমোহনের 'বেদান্ত দর্শন', অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অনেক লেখা, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষ' কিংবা 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলী অথবা একেবারে শেষের দিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনাবলী অনুরূপ প্রবন্ধ-চরিত্রের কয়েকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অন্তপক্ষে সমকালীন সাহিত্য সমালোচনার রাজপথ উৎসারিত হয়ে গিয়েছিল বঙ্কিম প্রবর্তিত বঙ্গদর্শনের কাল থেকে বিশেষ করে। সার্থক গ্রন্থ সমালোচনাও যে অধিবিদ্যাগত কর্ষণের অপেক্ষা রাখে বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিম তার নিঃসংশয় স্বাক্ষর রেখেছেন। আর

বাংলা সাহিত্যের উপাদান অবলম্বনে গবেষণা-অনুসন্ধান ঈশ্বর গুপ্তই সূচিত করেছিলেন 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায়, তাঁর সংকলিত 'কবিজীবনী' কেবল পথিকৃৎ নয়, এ বিষয়ে উল্লেখ্য আদর্শও। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা পঠন পাঠনের ব্যবস্থা এবং আরো বিভিন্ন কারণ ও প্রেরণাবশে এই শাখার বিস্তার আর সমৃদ্ধি ঘটেছিল।

এ-সবই বিশ শতকের প্রথম দুই শতকের কথা। অর্থাৎ উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে নানা সূত্রে নানা ধাপে বাংলা প্রবন্ধের যে বৈচিত্র্য ও পুষ্টি সাধিত হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপান্তর এবং সঙ্কুচন সাধিত হয়েছে ক্রমশ। জ্ঞানের চেয়ে রসের দিকে ঝোঁক গিয়েছে বাঙালী সাহিত্যপাঠকের বেশি করে, এবং সেখানেও আন্তরিক জীবন সন্ধানের চেয়ে বাইরে থেকে সংগ্রহের উৎসাহ গেল বেড়ে। ফলে আত্মমন্থন যেমন সৃজনশীল সাহিত্যে তারও চেয়ে বেশি পরিমাণে মননমূলক রচনার উপযোগী আত্মকর্ষণের প্রবণতা গেল কমে। ত্রিশের দশকেও ঝড় ঝাপটা অনেক গেছে,—কিন্তু চল্লিশের দশকে পৌঁছে দিল অবক্ষয়ের সৌমান্ত ধাপে। ফলে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা প্রবন্ধের ভূমিকা ব্যাপক সাহিত্যমোচনের দরবারে কোণঠাসা হয়ে গেল। সাময়িক সাহিত্য পত্রে সাহিত্য সমালোচনার নামে স্বজনের পৃষ্ঠ কণ্ডুয়ন সূত্রে ক্রমে এই শেষ ধারাটিরও অপমৃত্যু অবধারিত হল। কিন্তু ঐ সঙ্গেই প্রবন্ধ-চর্চার এক নূতন পটভূমিও গড়ে উঠল বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রবন্ধ সাহিত্য নয়, সাহিত্যের অনুসন্ধান ভিত্তিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখার 'উপাধি' লোভাতুর প্রয়াস। স্বাধীনতা উত্তর দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও পেটের ভাত জোটেনা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্যেও বুঝি একটা 'ডক্টরেট' ডিগ্রী হলে ভালো,—অন্তত সদ্য স্বাধীন যুগে রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায় যত্রতত্র গজিয়ে চলা কলেজের জলাভূমিতে অধ্যাপনা জীবির পক্ষে তো সে নিয়তম গুণ! জীবিকার দায়, অতএব নূতন যুগের ছাত্রবাৎসল্য দীনতারণের ভূমিকা নিলো তাতে কম ভালো হয়নি; কিন্তু সবটাই যাঁরা মন্দ হয়েছে বলেন তাঁরাও স্বভাব-নিন্দুক। পরিমাণের তুলনায় গুণের পরিসর হয়ত কম, কিন্তু বাংলা সাহিত্য, সমাজ, বাঙালীর জীবন ও ইতিহাস নিয়ে যা কিছু তথ্য উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর নয় কিছুতেই; তার সঙ্গে চিন্তা বেটুকু অন্বিত হল তার মান হয়ত খুব উঁচু নয়,—সর্বত্র তো নয়ই। তা হলেও ঋণাত্মক দিকটি নিয়ে আক্ষেপ যতই করা হোক এই সীমিত উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাভূমিতেও গবেষণা-প্রবন্ধের উৎকর্ষ বিধানের সম্ভাবনার কথা যথোচিত পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারত।

এই কথাটি মনে করিয়ে দিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' উপাধির স্বীকৃতি প্রাপ্ত একটি গবেষণা নিবন্ধ; ডঃ নবেন্দু সেন কৃত 'গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।' [পৃঃ ২৩+৩৫৫; প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা,' ১-এ কলেজ রো, কলকাতা-৯, মূল্য সতের টাকা]। অভ্যস্ত গতানুগতিকতার অর্থমনস্ক পরিবেশে এই সচেতনতার সঞ্চার ডঃ নবেন্দু সেনের এক শ্রেষ্ঠ দান; বাংলা গবেষণা নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম আবির্ভাব তাই সবিশেষ সংবর্ধনাযোগ্য।

বিষয়ের দিক থেকেও এই তরুণ গবেষকের নির্বাচন বিশেষ মূল্যবহ; বাংলা গদ্য প্রবন্ধের প্রথম স্বচ্ছতা প্রাপ্তির যুগে যুগন্ধর দুই শ্রেষ্ঠ লেখককে তিনি গ্রহণ করেছেন অনুসন্ধানের বিষয়রূপে।

এঁদের মধ্যে নৈকট্য যত নিবিড়, স্বভাব-দূরত্বও তেমনি আন্তরিক এবং দুস্তর ; দুই বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। অথচ পরস্পর সন্নিহিত এই দুই ব্যক্তিত্ব নানা দিক থেকেই পরস্পরের পরিপূরক। নির্বাচকের অন্তর্দৃষ্টি প্রথমাবধি একথা অনুধাবন করেছে।

দেবেন্দ্রনাথ প্রাচুর্যের মধ্যে জাত, বর্ধিত, অফুরন্ত সমৃদ্ধিতেই তার অবস্থান। তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান আলোচনাও হয়ে আছে গুণে ও পরিমাণে অমেয়। অক্ষয়কুমার তার বিপরীত। দরিদ্রের সন্তান, প্রাচ্য পরিবেশে জাত এবং লালিত ; উন্নয়নের সূত্রে গ্রাম-শহরের পার্থক্য তখনো ছিল একান্ত দুস্তর। অবিরাম যুদ্ধ করে ভাগ্যের সঙ্গে আমৃত্যু ছিল তাঁর হারজিতের খেলা। উত্তর সূরীদের হাতেও তাঁর মূল্যায়ন সুসম্পূর্ণ হয়নি। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা দুজনেরই লেখক সত্তার প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, স্বত্বাধিকারী ; অক্ষয়কুমার বেতনভুক্ত প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। অক্ষয়কুমার ইতিহাস-ও বিজ্ঞান-দর্শন-ভিত্তিক বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপাসক ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ মনস্বী-ধর্মসাধক, তাঁর দার্শনিক মনন ও যৌক্তিক চিন্তা কবি-মনস্বতার অনতিপ্রখর সহজ দীপ্তিবশে লাবণ্যযুক্ত। প্রথমজন বাংলা গদ্য প্রবন্ধে রামমোহনের ধারার সার্থক উত্তর সাধক ; দ্বিতীয় জন রবীন্দ্রপন্থার পূর্বসূরী ধ্রুবতারা। বরং এমন কথাও হয়ত বলা চলে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক সত্তার রাসায়নিক সমন্বয়-পরিণামই হয়ত 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বঙ্কিম। বিষয় নির্বাচনের মূলে এই পারস্পরিক বৈচিত্র্য-উদ্ভাসিত সাযুজ্যের চরিত্রটি নির্বাচকের দৃষ্টি এড়ায় নি, গ্রন্থ মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, যথাক্রমে স্বল্প ও বহুল আলোচিত এই দুই ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের রচনার মূল্যায়নে লেখক অভিন্ন মান প্রয়োগ করেছেন, বাংলা গদ্য বিচারের ইতিহাসে যা অভিনব। আর এই কারণেই দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়নি, অক্ষয়কুমারের মূল্যায়নের মত এখানেও তিনি সমপরিমাণে মৌলিক।

বাংলা সাহিত্যে হঠাৎ যখন স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন আরম্ভ হল, তারপরে এই দীর্ঘ উপেক্ষিত সাহিত্যের একটা মোটামুটি হলেও সামগ্রিক মূল্যায়নের আগ্রহ তথা প্রয়োজন প্রবল হয়েছিল। তাই ব্যাপক পরিচয় রচনার ব্যস্ততায় অনেক সময়েই অনুপুঙ্খ সন্ধান ও তার যথামূল্য বিচারের দায়িত্ব পরিহার করে চলা হয়েছে। তাই ছিল স্বাভাবিকও। যে-কোন বিষয়ের ব্যাপক চৌহদ্দি টুকুর জরিপ শেষ করে তবেই তার গভীরে প্রবেশ করতে হয় আভ্যান্তরীণ খুঁটিনাটির সন্ধানে। এই দ্বিতীয়োক্ত দাবীর তাগিদ ডঃ নবেন্দু সেন বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন। পূর্বসূরীদের গতানুগতিক অনুকরণের অভ্যস্ত পথ ছেড়ে। এই কারণেও তিনি বিশেষ প্রশংসারযোগ্য।

নূতন মূল্যায়নের নূতন মানদণ্ডও তিনি প্রয়োগ করেছেন। গ্রন্থনাম থেকেও বুঝি অক্ষয়কুমারও দেবেন্দ্রনাথকে প্রধানত ডঃ সেন গদ্যশিল্পী হিসেবেই পরিমাপ করে দেখতে চেয়েছেন ; এঁদের গদ্যরীতি বা 'স্টাইল'-ই তাঁর বিশেষ আলোচ্য ; সেই সূত্রে আধুনিক পরিসংখ্যানমূলক 'স্টাইলিকটিকস' বা প্রতীচ্য রীতিশাস্ত্রের মূল্যবান বাংলা গ্রন্থে ডঃ সেন এই প্রথম প্রয়োগ করলেন। এখানেও তাঁর ভূমিকা প্রথম যাত্রীর। পথের সূচনা করেছিলেন ডঃ শিশিরকুমার দাশ ইংরাজী ভাষায় লেখা তাঁর Bengali Prose Carey to Vidysaagar নামক গবেষণা গ্রন্থে। তিনিই ছিলেন ডঃ নবেন্দু

সেনের গবেষণা নিয়ামক অধ্যাপক। ডক্টর দাশের তুলনায় ডক্টর সেনের আলোচনার পরিধি আরো হ্রস্ব, মূল্যায়নের গভীরতা তাই আরো অনুপুঙ্খ হতে পেরেছে।

এক সময়ে বিভিন্ন লেখকের বিচ্ছিন্ন রচনাংশ থেকে যদৃষ্ট উদাহরণ সংগ্রহ করে বিভিন্ন লেখকের রচনারীতির মূল্যায়ন করতে চাওয়া হত। এদিক থেকে বত্রিশ সিংহাসনের উদ্ধৃতি সহযোগে মৃত্যুঞ্জয়কে সাবলীল গদ্যের রচয়িতা প্রতিপন্ন করলে কেবল মাত্র প্রবোধ-চন্দ্রিকার ভাষাংশ উদ্ধার করেই তাঁকে একাধারে চলিত রীতি কিংবা অবোধ্য প্রায় পণ্ডিতী কীর্তির লেখক বলে যুগপৎ প্রতিভাত করা যেতে পারে। ডঃ সেন তার বদলে নতুন পরিসংখ্যান সমর্থিত রীতির মাধ্যমে যে-কোনো একজন লেখকের বাক্প্রকরণ বা 'স্টাইল'-এর সম্পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করতে চেয়েছেন। লেখকের রচনার বিভিন্ন অংশ থেকে যথেচ্ছ উদাহরণ (sample) নিয়ে তারই মধ্য থেকে প্রযুক্ত শব্দগুচ্ছ, শব্দক্রম বা শব্দসজ্জা, বাক্য বিন্যাস, যতি চিহ্ন, অনুচ্ছেদ প্রভৃতির নির্মাণ ও ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যের আনুপাতিক হার কষে যথাসম্ভব গাণিতিক যাথাযাথ্যের সঙ্গে তাঁর 'স্টাইল'-এর পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়েছে। এই ধারানুসরণে 'তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা'র একটি নামহীন রচনা অক্ষয়কুমারের লেখা বলে সনাক্তও করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি ও নিরীক্ষণ শক্তি অভিনব, কিন্তু নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধাযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হয়, এক সময়ে ব্যক্তিমুখ্য ব্যাপকতা প্রত্যাশী মূল্যায়ণ বাংলা-গদ্যের সকল সাফল্যের একমাত্র আকর রূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকেই একচ্ছত্র করেছিল। বিশুদ্ধ গদ্যরীতির জন্মদান, তাতে ছান্দসিক লালিত্য সঞ্চার, নির্ভুল লয় ঝংকৃত বিরতি চিহ্নের প্রয়োগ, ইত্যাদি সকল কীর্তিরই উৎস নির্দেশ করা হয়েছিল বিদ্যাসাগরের রচনায়। বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা' সম্পাদক মণ্ডলীতে দেবেন্দ্রনাথ—অক্ষয়কুমারের সঙ্গী ছিলেন ; পত্রিকায় তাঁর রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ভাষা-শিল্পী রূপে তাঁর প্রথম নির্ধারিত আত্মপ্রকাশ আরো পরবর্তী কালের ঘটনা,—'বেতালপঞ্চ বিংশতি' (১৮৪৭) তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কীর্তি বিন্দুমাত্র খর্ব না করেও বাংলা যতিচিহ্নের ব্যবহারে অক্ষয়কুমার, কিংবা কাব্যস্বাদী গদ্য রচনায় দেবেন্দ্রনাথের, তথা ভাষা নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের দুজনের মৌলিক মহিমার প্রসঙ্গ ডঃ সেন গাণিতিক তথ্যচিত্র (chart) এবং নকশা (Graph) এঁকে পরিচ্ছন্ন প্রামাণ্য সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যচিত্রাদি প্রয়োগের প্রকরণ নিছক বিবৃতির চেয়ে কত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ আবেদনসহ হতে পারে তার চমকপ্রদ নিদর্শন আছে দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমারের ব্যক্তি-বিশ্বাসের পার্থক্য নির্দেশে (পৃ. ৩৬), অক্ষয়কুমারের রচনায় বিষয়পরিচয়নে (পৃ. ৫৪) কিংবা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' এবং উইলসন কৃত 'Religious seets of the Hindus' গ্রন্থ দুটির বিষয় পার্থক্য প্রদর্শনে (পৃ. ১০৬, ১০৭)। ব্যবহারের দক্ষতায় লেখক তাঁর প্রকরণকে নিঃসন্দেহে স্বীকৃতির আসন দান করতে পেরেছেন।

তথ্য নির্ণয়ের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি অক্লান্তকর্মা। বিশেষভাবে অক্ষকুমারের রচনাবলী সম্পর্কে অনেক অপরিচ্ছন্ন সংস্কার তাতে দূরীভূত হতে পেরেছে। 'ভারতবর্ষীর উপাসক সম্প্রদায়ে'র আলোচনা পরিধি যে 'Religious seets of the Hindus'-এর চেয়ে অনেক ব্যাপক তার গাণিতিক প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে। কিংবা, বাহ্যবস্তুর উপর কুমের প্রভাব সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে, চিন্তার দিক

থেকে উভয়ের কিছু মিল আছে সত্য ; কিন্তু অক্ষয়কুমার সোজাসুজি কুমের গ্রন্থের প্রভাবে 'বাহ্যবস্তু' রচনা করেন নি।—এই ধরণের স্পষ্টোক্তি গ্রন্থে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই সবকিছু মিলিয়ে অকুণ্ঠ ভাবেই স্বীকার করতে হয় যে, বাংলা গদ্য শিল্পের আলোচনায় ডঃ নবেন্দু সেন রীতি-বিজ্ঞানের ভাষাতত্ত্ব সম্মত আধুনিক মূল্যমান বাংলা গবেষণা গ্রন্থে প্রথম কৃতিত্বই নয় কেবল, সেই সঙ্গে তার সার্থক প্রয়োগের গরিমাও অর্জন করেছেন। সেই সঙ্গে গবেষণা মূলক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে গভীর অনুপুঙ্খ তথ্য-অধীকারও এক নতুন মান স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু সংশয়ও মনে দেখা দিয়েছে, লেখকের সামর্থ্য গরিমার পাশে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। তবু এই সমৃদ্ধ প্রথম প্রয়াসকে সব দিক থেকেই নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা দেবার দায়িত্বটুকুও এই তরুণ পথিকৃতদেরই গ্রহণ করতে হবে ; ডঃ সেন এবং ডঃ দাশ, যাঁরা রীতি বিজ্ঞানের আধুনিক প্রকরণটি আমাদের ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সাফল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ভাষা বিচারের এই প্রকরণটি বিজ্ঞান সমর্থিত, এবং পরিসংখ্যান যতটা নির্ভুল হতে পারে ততটা পরিমাণে নির্ভুলও নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বিচ্ছেদ-বিশ্লেষণমূলক আলোচনার পরেও শিল্পের সামগ্রিক স্বরূপটি আয়ত্ত করতে পারার পিপাসা থেকেই যায়। ফুলের নির্ভুল পরিচয় সংগ্রহে তার বোঁটা পাপড়ি থেকে বীজ কোষ পর্যন্ত সর্বাবয়বের পরিচয়টি বিচ্ছিন্ন করে নির্ভুলভাবে পেতেই হবে ; কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য তো তদারিক কিছু। দীর্ঘ আলোচনা শেষে একটি সংক্ষিপ্ত 'উপসংহারে' এই সামগ্রিক শিল্প রূপের সন্ধান লেখক করতে চেয়েছেন ; নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি অভদ্র। তাহলেও অত দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণের পরে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মন্তব্যে প্রয়োজনীয় প্রত্যাশা পরিপূরিত হয় না। লেখক নিজে বলেছেন, অক্ষয় আনলেন বিজ্ঞান সাধনার সাহিত্যিক রূপ এবং দেবেন্দ্রনাথ আনলেন ধর্মসাধনার সাহিত্যিক সৌন্দর্য। (পৃ-৩০৯১)। কিন্তু 'সাহিত্যিক রূপ' 'সাহিত্যিক সৌন্দর্যটি' কি সে কথা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হলো না তেমন, যেমন হয়েছিল এই তথ্য চিত্রাদির গাণিতিক উপস্থাপনা।

ডঃ শিশিরকুমার দাশ গ্রন্থের মুখবন্ধে নির্দেশ করেছেন, দেবেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা। (পৃ-১৩)। এই 'ধর্মীয় গদ্য'র স্বরূপটির পূর্ণ উদ্ঘাটন মূল গ্রন্থে প্রত্যাশিত ছিল। রাজনারায়ণ বসুর কথা মনে পড়ে। 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যিক বিষয়ক বক্তৃতা'তে দেবেন্দ্রনাথকে তিনি বক্তৃতার ভাষার প্রবর্তক বলেছিলেন। এবং গীর্জার খ্রীষ্টীয় পুরোহিতদের ধর্মপ্রচারের বক্তৃতামূলক রীতির সঙ্গ সাদৃশ্য সন্ধান করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজের প্রদত্ত বক্তৃতার ভাষার। তাঁর সিদ্ধান্তের গ্রহণীয়তা যাই হোক, বক্তব্যকে তিনি প্রাঞ্জল করেছেন। ইচ্ছে করলে ডঃ সেনও পূর্বসূরীর এই মূল্যায়ন পরীক্ষা করে দেখতে পারতেন হয়ত। কিংবা ঐ 'বক্তৃতা'-তেই রাজনারায়ণ দাবি করেছিলেন অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তু' ও 'ধর্মনীতি' প্রভৃতি অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অনুবাদ-মূলক রচনার তুলনায় 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় ধৃত তাঁর স্বকপোল রচিত প্রস্তাবই তাঁহার সর্বোত্তম রচনা। কয়েকটি রচনার নামোল্লেখও করেছিলেন রাজনারায়ণ। ডঃ সেন তাঁর অবলম্বিত প্রকরণের মানদণ্ডে 'তত্ত্ববোধিনীর' একটি রচনা অক্ষয়কুমারের লেখা বলে নির্দেশ করেছেন ; এই সূত্রে পূর্বসূরীর মূল্যায়নও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারত। এসব কথা ত্রুটি নির্দেশের

সূত্রে নয় ; কেবল অনুসন্ধানের আনুপুঙ্খিকতা হয়ত আরো সম্পূর্ণ হতে পারত। সবচেয়ে বড় কথা বিশ্লেষণের সকল প্রয়াস নির্ভুত হয়ে যাবার পরেও আশ্লেষমূলক একটি প্রত্যাশা। সৌন্দর্যসন্ধানের ক্ষেত্রে দুর্গম হয়ে থাকেই ; এ দুয়ের সমন্বয় সাধনের পথ তরুণ সন্ধানীরা খুঁজবেন, এই প্রার্থনার সঙ্গে ডঃ নবেন্দু সেনের অভিনব প্রথম প্রয়াসকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

ভূদেব চৌধুরী

ভারত ইতিহাস অভিধান (সিন্ধু সভ্যতা থেকে স্বাধীনতা) ॥ যোগনাথ মুখোপাধ্যায় ; পনেরো টাকা ; এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২।

৩৫৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই মূল্যবান বইখানির ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক বিভাগ বা রাষ্ট্রসীমার আয়তন নানা ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে—'কখনো উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান, কখনো বা পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ভারতের সীমানা বিস্তৃত হয়েছে। নেপাল ও ভারতের মধ্যেও দীর্ঘকাল কোন সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমানা ছিল না। কিন্তু এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের এক্তিয়ার ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে সৃষ্ট ভারতের সীমানায় সীমিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যা সম্পূর্ণরূপে আফগানিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশ প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব ব্যাপার তা এই গ্রন্থে স্থান পায়নি। তবে সিন্ধু সভ্যতা এই নীতির উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, কারণ সিন্ধু সভ্যতার পীঠভূমি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাকে বাদ দিয়ে ভারতের ইতিহাস শুরু করা যায় না। এরই কারণে সিন্ধুতে আরব অভিযানও এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তারপর আফগান যুদ্ধ, ব্রহ্মযুদ্ধ, নেপাল যুদ্ধ প্রভৃতিও এই গ্রন্থের বিষয়, কারণ ভারত ইতিহাসের পরম্পরায় তারা অপরিহার্য।' পাকিস্তান ও 'বাংলাদেশ'ও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার লেখকের কথায়—'এই গ্রন্থে শুধু সেইসব ভারত তত্ত্ববিদ্ স্থান পেয়েছেন যাঁরা ভারতে এসে ভারত ইতিহাসের রহস্য উদ্ঘাটনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।' পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে বটে, কিন্তু—'সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ অথবা করাচি, পেশোয়ার, ঢাকায় ভারতের ইতিহাসে একদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় শুধু বঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, যুক্ত প্রদেশ, অথবা কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতীয় প্রদেশ ও শহরগুলি।' বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য-পুরাণাদির কিছু কিছু প্রসঙ্গও তিনি নিয়েছেন এ বইয়ে।

বাংলায় এই ধরণের অভিধান যে বিশেষ স্মরণীয় প্রবর্তনা, তাতে সন্দেহ নেই। অভিনব গুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, দেলিউকস, সারজন শোর, মার্ক, বিবেকানন্দ ইত্যাদি ব্যক্তি প্রসঙ্গের বিচিত্রতা যেমন, তেমনিআবার নীল-বিদ্রোহ, খিলাফৎ আন্দোলন, ওয়াহাবি আন্দোলন—বা দ্রাবিড়, পালবংশ, ফা-হিয়েন, মগধ ইত্যাদি অন্যান্য প্রসঙ্গও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বিচিত্র জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি ঘটাবে।

কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি ইত্যাদি আছে, কিন্তু 'হিন্দু মহাসভা' নেই কেন? সে কি ১৯৪৭ এর আগস্টের পরের ঘটনা? 'হিন্দু উপনিবেশ'-এর পরে এই প্রসঙ্গটি পাওয়া যাবে বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু অনুল্লেখের কোনো সংগত কারণ বোঝা গেল না। বিনায়ক দামোদর সাভারকার প্রসঙ্গে হিন্দু মহাসভার উল্লেখ আছে যখন, তখন লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার ফলেই বোধ হয় এরকম কোনো কোনো প্রসঙ্গ বাদ গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি এই অভিধানে জায়গা পেয়েছেন, এবং তা খুবই প্রত্যাশিত; দীনবন্ধু মিত্র বাদ গেছেন,—এরকম অনুল্লেখ সম্বন্ধেও পরবর্তী সংস্করণে লেখক পুনর্বিবেচনা করবেন বলে আশা করি। নীহাররঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি আমাদের মধ্যে এখনো বর্তমান আছেন বলেই কি তাঁদের অনুল্লেখ ঘটেছে? ভূমিকায় লেখক অবশ্য এ বিষয়ে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন সেটির আগেই উল্লেখ করা হয়েছে,—'এই গ্রন্থে শুধু সেইসব ভারত-তত্ত্ববিদ্ স্থান পেয়েছেন যাঁরা ভারতে এসে ভারত ইতিহাসের রহস্য উদ্‌ঘাটনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন',—কিন্তু এ কৈফিয়ৎ ও পুনর্বিবেচনার বিষয়। তাছাড়া আরো অনেক প্রসঙ্গ আছে যা বাদ গেছে।

শ্রীযুক্ত যোগনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'গ্রন্থের বিষয়বস্তু বাছাই করা, বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো, প্রুফ-সংশোধন প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এক হাতে সাঙ্গ করতে হয়েছে।' এ যে গুরুতর অসুবিধার ব্যাপার, তাতে সকলেই একমত হবেন। এই অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি যে প্রভূত অধ্যবসায় ও দৃঢ় সংকল্প সহযোগে এই বইখানি প্রকাশকের হাতে দিতে পেরেছেন এবং প্রকাশক যে সমুচিত প্রযত্নে এটি প্রকাশ করেছেন, সেজন্য উভয় পক্ষই অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বেদ, উপনিষদ সম্বন্ধে আলোচনা আছে, কিন্তু সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক সম্বন্ধে তাহলে সংক্ষেপে পৃথক পৃথক প্রসঙ্গ হিসেবে কয়েকটি কথা থাকবে না কেন? চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অবশ্যই কিছু পরিচিতি থাকা উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবশ্যই ভারত ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তি। এরকম প্রসঙ্গ আরো কিছু কিছু ধরা পড়বে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় হয়তো ইতিমধ্যে নিজেই এরকম অনুল্লেখের তালিকা তৈরী করেছেন! পরবর্তী সংস্করণ ত্বরান্বিত হোক্—এটিই বিশেষ কামনা। তাঁকে পুনরায় অভিনন্দন জানাই।

হরপ্রসাদ মিত্র

★ ARUNA ★

ARUNA MILLS
MARINA

more DURABLE
more STYLISH

SPECIALITIES

Sanforized :
Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH

Printed :
Voils
Lawns Etc.

in Exquisite Patterns

ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD

★ ARUNA ★